ঠিক সকাল ন'টায় সমীর নীচে নেমে এল। এই সময় দরজায় দাঁড়ানো হুডখোলা গাড়িটায় ড্রাইভারের পাশে শিবুকাকা অবশ্যই বসে থাকবেন, সমীরকে তাঁর পাশের জায়গাটা নিতে হবে। সমীর ওঠার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জুতোয় মশমশ শব্দ তুলে পতিতপাবন নামবেন। তাঁর জন্য পেছনের পুরো সিটটা ছাড়া, একটু শরীর না ছড়িয়ে বসতে পারেন না।

আজ ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। সমীর গাড়িটার কাছে এসে থমকে গেল। পতিতপাবন আগেই পৌঁছে গেছেন। এখান থেকেই ওঁর বিরক্ত বিরাট মুখটা দেখা যাচ্ছে। তবে কি দেরি করে ফেলেছে খুব, সমীর আড়ষ্ট পায়ে সামনের দরজার দিকে এগোল।

'তুমি আজও গামছা পরে বেরিয়েছ?' পতিতপাবনের গলা শুনেও মুখ তুলল না সমীর। খুব সন্তর্পণে সামনের সিটে বসে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু দরজাগুলো বেয়াড়া, পুরনো গাড়ির ওপর পতিতপাবনের খুব মায়া। শিবুকাকা কেমন উদাস মুখে বললেন, 'শরীরে শক্তি থাকলে ব্যবহারে দোষ নেই। একটু জোরে বন্ধ করো খোকা।'

দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করলেন পতিতপাবন, 'আজকাল উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করো না দেখছি, হুম্।'

গাড়ি এখন বাঁধা রাস্তায় চলছে। এই পথে গেলে সবচেয়ে কম তেল খরচ হয়। সমীর খুব নিরীহ গলায় জবাব দিল, 'আমি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার মতো মগজ থাকলে তবে তো বুঝবে! পতিতপাবন রায়ের সন্তান জন্মাবার সময় কেউ তো বলে দেয়নি সে এত বড় জড়পদার্থ হবে। শিবে, ওকে বুঝিয়ে দাও।'

শিবুকাকা নস্যি নেন। পতিতপাবনের সামনে কখনোই নয় কিন্তু গলার স্বরে একটু নাকি ভাব এসে গেছে। পতিতপাবনের কথায় সমীরের দিকে নড়ে বসতে চেষ্টা করতেই পেছন থেকে মেঘ ডেকে উঠল, 'আঃ, তুমি দেখছি গাড়িটাকে নষ্ট করবেই। ওভাবে নাচালে স্প্রিংগুলো থাকবে? নিজের ওজনটা সম্পর্কে খেয়াল রেখো।'

কয়েক সেকেন্ড সময় দিলেন শিবুকাকা কথাগুলোকে মরে যেতে, তারপর সেই উদাস গলাটা ব্যবহার করলেন, 'বাবা খোকা, আজ তোমার পিতা তোমাকে এবং বধূমাতাকে নিয়ে তাঁর পালিতা মায়ের কাছে আশীর্বাদের জন্য যাবেন একথা তুমি জানো। এরকম একটা মঙ্গলকার্যের জন্য তোমার উপযুক্ত পোশাক পরা উচিত ছিল। সিল্ক না হোক রেশম কিছু।'

খেঁকিয়ে উঠলেন পতিতপাবন, 'কেন, আদ্দির ছিল না বাড়িতে? ভিখিরির মেয়েকে ঘরে এনেছি বলে দিনরাত খদ্দর পরে থাকতে হবে? লোকে দেখে কী বলবে? তুমি আমার ছেলে না চাষার? বাপের পয়সায় পায়ের ওপর পা দিয়ে খাচ্ছ বাপেরই দাঁত ওপড়াবে? মানসম্মান রাখার কথা খেয়াল হয় না।'

শিবুকাকা সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিলেন, 'কত বড় পিতার সন্তান তুমি বলো দেখি। যাঁর ঘরে লক্ষ্মী নিজে এসে বসে আছেন, হাইকোর্ট পাড়ায় কত নামডাক।'

আবার মেঘ ডাকল পেছনে, 'শিবে, যা জানো না তাই বলা তোমার স্বভাব। লক্ষ্মীর দায় পড়েছে কারও ঘরে সেধে যেতে। সে মাগি অত ফ্যালনা নয়। ওকে ঘাড় ধরে টেনে ঘরে ঢোকাতে হয়, যার তার সে ক্ষমতা থাকে না বুঝলে? তা হলে তুমি সামনের সিটে আর আমি এখানে বসতাম না।'

শিবুকাকা একটুও গায়ে মাখলেন না কথাটা। ঢুলুঢুলু চোখে সামনের রাস্তায় তাকিয়ে বললেন, 'সে কথা বলতে, গাছ আর আগাছার মধ্যে কোনও তুলনা চলে? তবে কাঠবিড়ালিও রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন, সেইটুকুই তার আনন্দ।'

'তা ঠিক।' পতিতপাবনকে হঠাৎ উদার শোনাল, 'তুমি না থাকলে অসুবিধে হত। পৃথিবীটা অসৎ মানুষে একদম ভরে গেছে। পুত্র পিতার আদেশ মানতে চায় না বুঝলে।' সমীর ভেবেছিল বাক্যস্রোত

এখন শিবুকাকার দিকে বইবে, পতিতপাবন যে সেটাকে আবার তার দিকেই ফিরিয়ে আনবেন—সমীর গম্ভীর মুখে রাস্তা দেখতে লাগল।

পুরো নাম পতিতপাবন রায়, সংক্ষেপে পি পি আর বললে হাইকোর্ট পাড়ার সবাই চেম্বারটা দেখিয়ে দেবে। এরকম দুঁদে অ্যাটর্নি না হলে এত অল্প সময়ের মধ্যে নামডাক ছড়ায় না। বিরাট উকিল-বাড়িটার দোতলায় দুটো ঘরের অফিসের সামনে কাঠের ফলকে ওঁর সংক্ষিপ্ত নাম জ্বলজ্বল করছে। তিন বছর হয়ে গেল সমীর বাবার সঙ্গে বেরুচ্ছে। বেরুনো মানে একসঙ্গে গাড়িতে করে অফিসে আসা, একটা নির্দিষ্ট টেবিলে বসে থাকা আর ঠিক পাঁচটা বাজলেই বেরিয়ে পড়া। পতিতপাবনের ফিরতে রাত হয় তাই পুত্রের ক্ষেত্রে এই উদারতা তিনি দেখিয়েছেন, কাজ বলতে মাঝে মাঝে আয়ব্যয়ের হিসাবটা ঠিক কি না পরীক্ষা করা অথবা কোনও মক্কেলকে চিঠি লেখা। সাধারণত খুব প্রয়োজন ছাড়া পতিতপাবন সমীরকে আদালতে নিয়ে যেতে চান না। সেসব ব্যাপারে তাঁর ডানহাত শিবুকাকা। আইন ব্যবসা ছাড়া আর একটি শাখা আছে যা থেকে প্রচুর অর্থ উপায় করেন পতিতপাবন। সেটা হল তেজারতি ব্যবসা।

পতিতপাবন, শিবুকাকা এবং সমীর একই ঘরে বসেন। পিতার তুলনায় পুত্রের টেবিল বামনসদৃশ, সে তুলনায় শিবুকাকা বেশ ব্যালেন্স রেখেছেন। সমীর টেবিলে বসতেই শিবুকাকা দু' পাতার একটা হিসেব এগিয়ে দিলেন, 'বাবা সমীরকান্তি, এই যোগটা একটু করে ফেলত।' মেজাজটা খিচড়ে গেলেও শান্ত মুখে কাগজটা হাতে নিল সমীর। এইসব লম্বা লম্বা যোগ করা যেমন বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার তেমনি সেটা ঠিক হয়েছে কি না মিলিয়ে দেখা আরও বিরক্তিকর। ওপাশে পতিতপাবন গম্ভীর মুখে একটা ফাইল পড়ছেন, সমীর কাগজটাকে টেবিলে রেখে চিন্তা করল এই দিয়ে আজকের দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যায় কি না। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে পতিতপাবনের বাইরে বেরুনোর ওপর।

ঠিক সাড়ে দশটা নাগাদ সেই ভদ্রলোক এলেন। তাঁকে দেখেই শিবুকাকা সহাস্যে সম্বোধন জানালেন, 'আরে আসুন আসুন নাগমশাই। আপনার কথাই গতকাল কর্তা জিজ্ঞাসা করছিলেন। তা আমি বললাম নাগমশাই তো কখনও দিন ভোলেন না।'

সমীরের মনে পড়ল লোকটার নাম চতুর্ভুজ নাগ। একটা মানুষের এরকম নাম কী করে রাখা হয় কে জানে। সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃশ্যটাও চোখের সামনে দেখতে পেল। এর আগের বার, তা প্রায় ছয় মাস হবে, চতুর্ভুজবাবু এই ঘরে এসেছিলেন। সমীর মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। এখনই এই ঘরে একটা কাণ্ড ঘটবে।

চতুর্ভুজ নাগ পতিতপাবনের সামনে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বুকের ওপর হাত জোড় করলেন। পতিতপাবনের বিরাট মুখে সামান্য কুঞ্চন উঠল, ওটা যে হাসির সেটা বুঝে নিতে হয়। 'বসুন নাগমশাই। আপনার নিয়মানুবর্তিতা দেখে খুশি হয়েছি। দেশের যা অবস্থা কেউ তো আর নিয়ম মানছে না। আপনাকে দেখে তবু আশা হয়।'

চতুর্ভুজ বললেন, 'আমার পিতৃদেবের আদর্শে মানুষ আমি। আমি বিশ্বাস করি চেষ্টা করলে সব সম্ভব হয়। আমার পিতৃদেব সে মতোই আমাকে শিখিয়েছেন।'

পতিতপাবন বললেন, 'তিনি পুণ্যবান। এরকম পুত্র পাওয়া সকলের ভাগ্যে হয় না।' সমীর জানে এই সময় পতিতপাবন তার দিকে একবার তাকাবেনই।

চতুর্ভুজ সঙ্গের হাতব্যাগটা খুলতে খুলতে বললেন, 'নিন, দায়মুক্ত করুন।'

পতিতপাবন শিবুকাকার দিকে ইঙ্গিত করে কিছু আনতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী খাবেন বলুন, চা কিংবা শরবত?'

'না না, এইমাত্র ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। আমাকে আবার এখনই পাথুরেঘাটায় যেতে হবে। আচ্ছা, আপনার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। এটা হল সেই মূল অংশ।' একতাড়া নোট, রবার ব্যান্ডে আটকানো, বাঁদিকে সরিয়ে রাখলেন চতুর্ভুজ। তারপর আরও কিছু টাকা বের করে বললেন, 'এটা হল সুদ, মাসিক তিন টাকা হারে ছয় মাসের জন্য মোট সুদ হল আঠারো শো।'

পতিতপাবন হেসে বললেন, 'বাঃ, আপনার দেখছি হিসেবপত্তর একদম পাকা। কই হে শিবে, নাগমশাইকে রসিদটা ফিরিয়ে দিয়ে টাকাগুলো বুঝে নাও।'

সমীর দেখল শিবুকাকা শেয়ালের মতো পা ফেলে বাবার টেবিলটার কাছে গিয়ে একটা ফাইল

খুললেন, 'এই নিন নাগমশাই, আপনার সইকরা রসিদ, ঠিক দেখে নিন। আচ্ছা, এখানে দশ সহস্র মূল টাকা আছে? আর এটা হল আঠারো শো, সুদ?' টাকাগুলো তিনি গুনে দেখে নিয়ে বাবার হাতে দিলেন। পতিতপাবন তার পেছনে দাঁড় করানো সিন্দুকের দরজা খুলে সেখানে ওগুলো রেখে আবার তালা দিয়ে দিলেন। এই চাবি বাবা কাউকে দেন না, এমনকী শিবুকাকাকেও না। পতিতপাবন একটা কথা প্রায়শই বলে থাকেন, 'স্ত্রীকে সময়বিশেষে বিশ্বাস করা যায় কিন্তু টাকাকে কখনওই নয়।'

চতুর্ভুজবাবু রসিদ শিবুকাকার হাত থেকে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে পকেটে পুরতেই পতিতপাবন সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'তা হলে নাগমশাই-এর সঙ্গে আমাদের চুক্তি ভালয় ভালয় মিটে গেল, কী বল হে শিবে?'

সমীর দেখল, শিবুকাকা ঘাড় নেড়ে না বলছেন, না মেটেনি।

চতুর্ভুজবাবু সেটা লক্ষ করে বিস্মিত গলায় বললেন, 'কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

পতিতপাবন বিরক্তি মাখানো গলায় বললেন, 'দেখলে তো উনি গুনে গুনে সব টাকা সুদসমেত দিয়ে দিলেন, তাও বলছ মেটেনি। ব্যাপারটা কি হে?'

শিবুকাকা সেই শেয়ালের হাসি হাসলেন, 'আজকাল আপনার স্মরণশক্তিটা—হেঁ হেঁ, নাগমশাই সেদিন সকালে দশ হাজার নিয়ে যাওয়ার পর আবার ঘুরে এসে বললেন না যে তাঁর আরও দশ দরকার। একই হারে তিনি নিয়ে গেলেন সইসাবুদ করে।'

চতুর্ভুজ নাগকে দেখল সমীর। মুখ হাঁ হয়ে গেছে, চোখদুটো বিস্ফারিত। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছেন শিবুকাকার দিকে। সমীরের মনে হল এখানে থাকলে সে আর একটা অন্যায়ের সঙ্গী হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই চেয়ার ছেড়ে উঠে যাওয়া পতিতপাবন ক্ষমার চোখে দেখবেন না। সে শুনল পতিতপাবন বলছেন, 'ওহো, মনে পড়েছে। তাইতো সেটাও বোধহয় আজকেই শোধ করার দিন ছিল তাই না নাগমশাই?'

চতুর্ভুজ নাগের রক্তহীন ঠোঁটদুটো নড়ল, 'আপনারা কী বলছেন? আমি তো মাত্র দশ হাজারই নিয়েছি, দ্বিতীয়বার এসে—না না এটা আপনাদের রসিকতা, কি বলেন?'

'সেকী!' শিবুকাকা বলে উঠলেন, 'আপনার সইকরা রসিদ আমার ফাইলে আছে আর আপনি বলছেন রসিকতা! এর মানে আমি বুঝতে পারছি না।'

চতুর্ভুজবাবুর শরীরের রক্ত এখন কিছুটা স্বাভাবিক, 'আমিও না। কারণ যদি সেরকম রসিদ থাকে তা হলে সেটা জাল। আপনারা যে জালিয়াতির কারবারে নেমেছেন সেটা জানা ছিল না, জানলে আমি আসতাম না।'

এতক্ষণে পতিতপাবনের গলা নিজের চেহারায় এল, 'মুখ সামলে কথা বলুন নাগমশাই, সামান্য দশ হাজার টাকার জন্য এত বড় অপবাদ আমি মাথা পেতে নেব না। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনি আমাদের জালিয়াত প্রমাণ করুন। আর যদি না পারেন তা হলে আপনার ভিটে পর্যন্ত আমি বন্দক করিয়ে তবে ছাড়ব। আমি পতিতপাবন রায়—অপমানিত হবার জন্য জন্মাইনি।'

চতুর্ভুজ ছটফট করে উঠলেন, 'বাঃ বেশ, আমি টাকা নিলাম অথচ আমি সেটা জানলাম না? কই দেখি কী রসিদ দেখাবেন আপনারা।'

শিবুকাকা সঙ্গে সঙ্গে একটা ফাইল বের করে সন্তর্পণে সেটা খুলে চতুর্ভুজবাবুর নাগালের বাইরে এমন ভঙ্গিতে উঁচিয়ে ধরলেন যাতে তিনি সেটা সেখান থেকেই স্পষ্ট পড়তে পারেন, 'দেখুন এটা আপনার সই কি না, নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না?'

চোখের সামনে ভূত দেখলেন যেন চতুর্ভুজবাবু, ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠলেন, 'আরে, এতো আমারই সই। কিন্তু, কিন্তু—।'

'শুধু সই নয়, তারিখটাও আপনার নিজের হাতে লেখা।' শিবুকাকা ফাইল বন্ধ করলেন।

'কিন্তু আমি তো দশ হাজারের বেশি নিইনি।' পকেট থেকে প্রথমে পাওয়া রসিদটা বের করে চতুর্ভুজবাবু সেটা আর একবার দেখে নিলেন। সমীর দেখল পতিতপাবনের মুখ গম্ভীর, 'নাগমশাই, কেটে যাওয়া রেকর্ডের মতো এককথা বার বার শোনাবেন না। যদি টাকাটা শোধ দিতে না পারেন তা হলে সেটা আদায় করে নেবার রাস্তা আমার জানা আছে।'

চতুর্ভুজ খানিকক্ষণ অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলেন, কী করবেন যেন বুঝতে পারছেন না।
চতুর্ভুজ খানিকক্ষণ অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকলেন, 'আপনারা আমায় ঠকালেন, উঃ, কী বোকা আমি।'
তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠলেন, 'আপনারা আমায় ঠকালেন, উঃ, কী বোকা আমি।' কিছুক্ষণ চুপচাপ
শিবুকাকা বললেন, 'কেউ কাউকে ঠকাতে পারে না নাগমশাই, একে কর্মফল বলে।' কিছুক্ষণ চুপচাপ
সব, পতিতপাবন একদৃষ্টিতে চতুর্ভুজকে দেখছেন। হঠাৎ চতুর্ভুজ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, 'ঠিক আছে,
এই টাকা আমি দিয়ে যাব এক মাসের মধ্যে তবে আমি আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি রায়মশাই এর ফল
আপনি ভোগ করবেন। মরবার সময় আপনার মুখে কেউ জল দেবে না।' বলে হন হন করে বেরিয়ে
যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন চতুর্ভুজ নাগ। সমীরের টেবিলের সামনে এসে, 'সেদিন আমি যখন টাকা
গুনে নিই তুমি তখন ছিলে বাবা, ওরা কি বাতিল রসিদটা আবার কুড়িয়ে রেখেছিল? ধর্ম যদি মানো
তা হলে সত্যি কথা বলো।'
সমীর কী বলবে ঠাওর করার আগেই পতিতপাবনের জলদ-গম্ভীর স্বর ভেসে এল, 'নাগমশাই,
আমগাছের বোলে সুপুরি হয় না—এই সাধারণ সত্য জানেন না? আপনি যার সঙ্গে কথা বলছেন সে
আমার একমাত্র বংশধর।' কথাটা শোনার পর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না চতুর্ভুজ নাগ।
সমীর ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ বসে থাকল। এখন ঘরে ঢুকলে কেউ বুঝবে না যে একটু আগে অমন
নাটক হয়ে গেছে। শিবুকাকা তাঁর কাজে ব্যস্ত, পতিতপাবন ফাইল দেখছেন। সেদিনের ঘটনাটা পরিষ্কার
চোখের ওপর ভাসছে। টাকা ধার করতে এসেছিলেন চতুর্ভুজবাবু। এর আগে হাজার দু' হাজার
নিয়েছেন, শোধও করেছেন। এবার বেশি প্রয়োজন। প্রথমে সুদ নিয়ে কিছুক্ষণ দর কষাকষি চলল।
এসব ব্যাপারে শিবুকাকাই কথা বলেন, শেষ রায়টা দেন পতিতপাবন। শেষ পর্যন্ত তিন টাকাতে নামার
পর রসিদ তৈরি হল। চতুর্ভুজবাবু সই করার পর সাক্ষী হিসেবে শিবুকাকা সই করতে গিয়েই কাণ্ডটা
করে ফেললেন। কলম উপচে কালি পড়ে গেল কাগজের এক কোণে। সঙ্গে সঙ্গে খিঁচিয়ে উঠলেন
পতিতপাবন, 'আঃ, দিলে একটা শুভকাজে ব্যাঘাত করে। রসিদ হবে ছিমছাম পরিষ্কার—একগাদা
কালি ঢেলে ভূতের নেত্য শুরু করে দিলে। তোমার আর কাণ্ডজ্ঞান হল না শিবে।' এই বলে রাগ
দেখিয়ে রসিদটাকে মুঠোয় নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন ঘরের কোনায়। 'নাও, আর একটা রসিদ করো। এবার
নাগমশাই-এর কলমে সই করো, মানুষের রুচির প্রকাশ পায় তার স্ত্রী আর কলমে। তোমার যে দুটোই
নেই ছাই।' চতুর্ভুজ নাগ এই রসিকতায় হেসে উঠলেন। আবার রসিদ তৈরি হলে সইসাবুদের পর তিনি
টাকা নিয়ে বিদায় হলেন। ব্যাপারটাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল সমীরের। কিন্তু তারপরেই
শিবুকাকার আচরণ ওকে স্তম্ভিত করে দিল। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া কোঁচকানো রসিদটা ঘরের কোণ থেকে
তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে হাতের চেটো দিয়ে সমান করলেন শিবুকাকা। পতিতপাবন খুব
স্বাভাবিক মুখ করে সেটা দেখে বললেন, 'একটু গরম ইস্ত্রি রেখে দিলে আর ভাঁজ থাকবে না।'

শিবুকাকার খিক খিকে হাসিটা এখনও কানে লেগে আছে সমীরের, 'বাছাধন এর পরদিন যখন আসবেন তখন তিড়িং তিড়িং করে লোংকিনৃত্য মারবেন।'

পতিতপাবন যেন নিজের কাজের পেছনে যুক্তি দেওয়ার ভঙ্গিতে সমীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পৃথিবীতে বাস করতে গেলে চোখ কান খুলে রাখতে হয়। অসতর্ক মানুষের জন্য দুর্ভাগ্য সব সময় ওত পেতে থাকে।'

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সমীর। একবার ভাবল, না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সৌজন্যে বাধল তার। পতিতপাবনের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুললেন তিনি। মনের ভাব মুখে বোঝা যায় না। সমীর দেখল তার গলার শব্দ কথা ফোটাচ্ছে না।

পতিতপাবনের ঠোঁট নড়ল, 'কিছু বলবে?'

সমীর ইতস্তত করে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'কোন চুলোয়?' পতিতপাবন চোখ সরালেন না।

'আমার এখানে কাজ করতে ভাল লাগছে না।' সাহস করে কথাটা বলে ফেলল সমীর।

'কী করবে?'

প্রশ্নটা যে আসবে ভাবতে পারেনি সে। সমীর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে কী বলবে না করতে করতে বলে ফেলল, 'আমি ব্যবসা করব।'

'ব্যবসা? তুমি? বায়ু চড়েছে নাকি! ওহে শিবে, তোমার ভাইপোর কথা শুনেছ?'

'আমি প্রেস খুলতে চাই।' মরিয়া হয়ে গেল সমীর।

'প্রেস? ওইসব কুলিকামিনদের সঙ্গে কাজ? একটা প্রেসওয়ালা ভদ্রলোকের নাম করতে পারো? তা এসব জ্ঞান সেই ভিখিরির মেয়ে দিচ্ছে বুঝি! স্বামীর রোজগার দেখার খুব সাধ তার, অ্যাঁ। ওসব হবে না। ব্যবসা করতে হলে নিজের পয়সায় করো, আমার কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবে না।' পতিতপাবন দুটো থাবা টেবিলের ওপর শব্দ করে রাখলেন।

শিবুকাকা বললেন, 'বাবা সমীরকান্তি, তোমার আজ বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। বড্ড গরম পড়েছে।'

সমীর মাটিতে দৃষ্টি রেখে বলল, 'আমি তা হলে বেরুচ্ছি।'

পতিতপাবন বললেন, 'শিবে যে যোগটা করতে দিয়েছিল সেটা হয়েছে? ওটা শেষ করে যেও।' তারপর কেমন উদাস গলায় বললেন, 'বুঝলে শিবে, সব গাছে যদি ফুল-ফল হত, তবে পৃথিবীটা ধনধান্য পুষ্পেভরা হয়ে যেত, কী আর করা যাবে।'

দুপুরবেলায় হাইকোর্ট পাড়া বাজারের মতো হয়ে যায়। এই সময় মানুষগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয় সবাই এক-একটা ধান্দা নিয়ে ঘুরছে। সমীর নীচে নেমে ঘড়ি দেখল, বিয়েতে পাওয়া ঘড়ি, একটা বাজে। তিন ঘণ্টা সময় আছে হাতে। বেরুবার সময় শিবুকাকা বলে দিলেন যে ঠিক চারটের সময় বধূমাতাকে আনতে গাড়ি যাবে, সমীর যেন একসঙ্গে ফিরে আসে। আজ বিকেলে পতিতপাবন বাগবাজারে যাবেন তাঁর পালিতা মাকে প্রণাম করতে। বাগবাজারের বাড়িতে সে কোনওকালে যায়নি। ওখানে নাকি পতিতপাবনের ছেলেবেলা কেটেছে। কিন্তু তার বিয়ে হয়ে গেল মাসখানেক হল আর এতদিনে পতিতপাবনের মনে পড়ল পালিতা মায়ের কথা। সমীর পেছন ফিরে দোতলায় পি পি রায়ের অফিসটার দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করল এখানে সে ফিরবে না। না, সরাসরি বাপের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ক্ষমতা তার নেই কিন্তু সব কিছু মেনে নিতে পারা যায় না। সেরকম হলে তো সে চতুর্ভুজবাবুকে সকালে সব কথা বলে দিতে পারত। কিন্তু তা পারে না সমীর। কেন পারে না? কেন শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়।

ভরদুপুরে বাড়ি ফিরে এল সে। চুপচাপ দোতলায় উঠে নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে দেখল দরজা বন্ধ। দুবার কড়া নাড়ার পর ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ পেল সমীর। একটু বাদেই বাঁদিকের কাচের জানলায় বউ-এর মুখ দেখতে পেল সে। এক পলক বাদেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ভেতরে যে উত্তেজিত হয়েছে ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারল সমীর। মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল সে, 'দরজা বন্ধ করে কী করছিলে?'

নতুন বউ-এর নাম গোপা। মুখের দিকে তাকালে চোখের আরাম হয়। এই সময় সমীরকে আসতে দেখে সে যতটা অবাক হয়ে গিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি চমকে উঠল গলার স্বরে। খুব আস্তে আস্তে উত্তর দিল, 'মা দরজা খোলা রাখতে বারণ করেছেন।'

'মা বারণ করেছেন, কেন?' জামা খুলতে গিয়ে থমকে গেল সমীর। অদ্ভুত কথা, একটা মানুষকে খামোকা দরজা বন্ধ করে থাকতে বলা হবেই বা কেন? গোপা খুব বিব্রত মুখে একবার বাইরের দিকে তাকাল। বলবে কি বলবে না ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত চাপা স্বরে বলে ফেলল, 'কুকুর।'

খাটের ওপর ধপ করে বসে পড়ল সমীর। ওদের এই বাড়িতে দুটো বিশাল কুকুর আছে বটে কিন্তু তাদের ভয়ে দোতলার দরজা বন্ধ রাখতে হবে একথা চিন্তাও করা যায় না। সে হেসে বলল, 'কুকুর দোতলায় উঠে আসবে তোমার জন্য এ খবর কোথায় পেলে?'

তেমনি নিচু গলায় গোপা বলল, 'মা।'

ভুরু কুঁচকে গেল সমীরের, 'মা তোমাকে বলেছেন দরজা বন্ধ রাখতে?'

মাথা নাড়ল গোপা, 'কুকুরগুলো নাকি অচেনা মানুষ দেখলে কামড়ে মেরে ফেলবে, তাই মা প্রথম দিকেই আমাকে সারাক্ষণ দরজা বন্ধ রাখতে বলেছিলেন।'

হাসবে না রাগবে কিছু বুঝতে পারছিল না সমীর, 'তুমি সারাদিনে বাথরুমে যাও না?'

'খুব প্রয়োজন হলে মা দরজায় শব্দ করতে বলেছেন, তখন সুন্দরদা এসে খুলে দেন দরজা।' গোপা অনেক কথা বলে ফেলেছে এমন ভঙ্গি করল।

'খুলে দেন মানে? দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ রাখো—তা হলে খুলে দেবে কী করে?'

'বাইরে থেকেও শিকল টানা থাকে।'

হঠাৎ বাইরে ঝন ঝন শব্দ উঠতেই গোপা দ্রুত ঘরের অন্য কোণে সমীরের থেকে বহু দূরে সরে গেল। দু হাত খাটের ওপর রেখে সমীর বসেছিল, শব্দটা সেও চেনে। দরজায় এসে শব্দটা থেমে গেল। কপাট ভেজানো, ওপার থেকে গলা ভেসে এল, 'খোকার কি শরীর খারাপ হয়েছে, বউমা?'

গোপা স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখল সমীর ঘাড় নেড়ে না বলছে। সে উত্তর দিল, 'না।'

'তা হলে এই ভরদুপুরে বাড়ি এল কী করতে? কর্তা শুনলে রাগ করবেন। তোমার বাড়িতে কেউ শিখিয়ে দেয়নি যে স্বামীকে দুপুরে ডেকে পাঠাতে নেই, ছিঃ।' গয়নাগুলো শব্দ করতে করতে ফিরে গেল।

দুপুরে কেন বাড়ি এসেছিল সমীর জানে না। বাবার অফিসে ভাল লাগছিল না, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এই কয়দিনে গোপাকে ওর খুব ভাল লেগেছে, এরকম ভাবে কোনও মানুষকে নিজের করে কখনও পায়নি সে, নিজের অজান্তেই ইচ্ছেটা টেনে এনেছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি নীচে যাচ্ছি, চারটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ো, গাড়ি আসবে বাগবাজারে নিয়ে যেতে।' দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। দুটো ঠোঁট চেপে থর থর করে কাঁপছে গোপা, সারা মুখ জলে ভেসে যাচ্ছে, এখনই ধরে না ফেললে সে পড়ে যাবে।

২

একটু আগে সমীরকান্তি নীচে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'কেঁদো না, তুমি কাঁদলে আমার কষ্ট হয়।' ব্যস ওইটুকুই। আমি তাঁর স্ত্রী এইরকম অপমানিত হয়ে কাঁদছি দেখে কী ওই কথাগুলোর বেশি কিছু করার ছিল না ওঁর? আশ্চর্য!

এ বাড়ির কিছুই আমি বুঝতে পারি না। অবশ্য এই বাড়ি বলতে ঘর আর বাথরুম আর মাসে একদিন শ্বশুরমশাই-এর সামনে ছাড়া কোথাও আমায় যেতে দেওয়া হয়নি। শ্বশুরমশাই অত্যন্ত রাশভারি মানুষ, দেখলেই ভয় করে। আগেকার দিনের জমিদারদের নাকি ওরকম চেহারা ছিল। শাশুড়িকে আমি একটুও বুঝতে পারি না। চল্লিশের কাছে বয়স, কিন্তু কেমন খুকি খুকি ভাব করেন। মুখে ভীষণ ধার, কথা যখন বলেন তখন হাড়ে অবধি কাঁপুনি লাগে। ননদ আমার চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু আমার কাছে একদম ঘেঁষে না। বনেদি বাড়ি সম্পর্কে গল্প শুনতাম, তারা যে এ-ধরনের তা কখনও চিন্তা করতে পারিনি।

বাবা মারা যাওয়ার পর মা আর আমি তখন পৃথিবীতে একদম একা। খেতে পাওয়াটাই যখন সমস্যা তখন আমার বিয়ের কথা মা ভাবতে পারেন না। আমার এক মামাতো দাদা থাকতেন কালীঘাটে। তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে গিয়ে থাকতাম। সেইরকম একটা দিনে আমার স্বামী সমীরকান্তি দাদার কাছে বেড়াতে এলেন। দাদার সঙ্গে এক কলেজে পড়তেন, সেই সুবাদে আসা। আমি আগে কখনও দেখিনি। শুনলাম খুব বড়লোকের ছেলে, চেহারা দেখে অবশ্য তা মনে হয় না। দাদা বলল খুব গুডি বয়। আমি চা দিয়েছিলাম।

তার পরদিনই এল সেই লোকটা। রোগাটে সিড়িঙ্গে চেহারা। নস্যি নেওয়ায় নাকে কথা বলেন। বগলে ছাতি। এসে দাদাকে শাসালেন, 'বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা করছ বাবা। রায়বংশের অর্থ মর্যাদার সঙ্গে তোমাদের কোনও তুলনাই চলে না। ছেলেটা ন্যালাখাবলা বলে ভুজং দেবে তা পতিতপাবন রায় বরদাস্ত করবে না।'

দাদা আকাশ থেকে পড়ে এসব বলার কারণটা জানতে চাইলেন। ভদ্রলোকের নাম শিবনাথ দত্ত। সমীরকান্তিদের আত্মীয়—সে বাড়ির ম্যানেজার। গতকাল সমীরকান্তি বাড়ি ফিরে গিয়ে হঠাৎ অন্যরকম আচরণ করেছিলেন। ইদানীং তাঁর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, বড় বড় ঘরে দেখাশুনা হচ্ছে। কিন্তু সেদিন তিনি সটান তাঁর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, একটি মেয়েকে আজ কালীঘাটে বন্ধুর বাড়িতে দেখেছেন, বিয়ে যদি করতে হয় সেখানেই করা ভাল। তাঁর পিতা নাকি কথাটা শুনে এক মিনিট স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলেন। ছেলের এরকম আচরণে তিনি নাকি একদম অভ্যস্ত নন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, 'দূর

হয়ে যা সামনে থেকে।'

কথাটা এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমার স্বামীকে বিয়ের পর যেটুকু চিনেছি তাতে এরকম আচরণ তাঁর দ্বারা কীভাবে সম্ভব হয়েছিল আমি বুঝতে পারি না। এত ভাল মানুষ, মাটির চেয়ে নরম মন, সামান্য প্যাঁচ বোঝেন না, কিন্তু অদ্ভুত নির্জীব। ওঁর বাবা যদি আদেশ করেন স্ত্রীকে ত্যাগ করতে, বোধহয় তারও প্রতিবাদ করতে পারবেন না। এরকম মানুষ কী করে বাবার সামনে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা বলতে পারল আমি চিন্তাও করতে পারি না। একদিন রাত্রে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললেন, 'কী করব, তোমায় দেখে এমন ভাল লেগেছিল মনে হল না বললে অন্যায় হবে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন ভাল লেগেছিল? আমি তো আর পাঁচটা মেয়ের মতনই।'

ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন, 'না, মোটেই না। তুমি অন্যরকম।'

আমি কী রকম? ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি আমি সুন্দরী। আমি কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বুঝতে পারি। ছেলেবেলায় দেখেছি বাবা প্রচুর অর্থে আমাদের সুখে রেখেছেন, পরবর্তীকালে অভাব কী জিনিস তাও দেখেছি। আমার দাদা যখন শিবনাথবাবুকে জানালেন যে, সমীরকান্তিকে জামাই করবার ব্যাপারে আমাদের কোনও উৎসাহ নেই তখন ভদ্রলোকের যেন ঠিক বিশ্বাস হল না। তিনি আমাকে একবার দেখতে চাইলেন। বাড়ির ভেতরে এসে দাদা যখন মাকে সেকথা জানাল আমি আপত্তি করলাম। প্রথম কথা উনি এসেছেন শাসাতে; অতএব দেখতে চাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু মানুষের মন বোঝা দায়, আমার মা বললেন, 'একজন বয়স্ক মানুষ তোকে দেখতে চাইছে, বিয়ে হোক না হোক তোর একবার দাঁড়ানো উচিত।' যেভাবে ছিলাম সেভাবেই বেরিয়ে এলাম। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল আমার ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে। দুটো গর্তে ঢোকা চোখ যেন নারকেল কোরার মতো আমায় কুরতে লাগল। প্রথম দিন থেকেই আমি লোকটাকে পছন্দ করিনি।

সেদিনই আমরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। নিজেদের বাড়ি মানে বাবা শেষ পর্যন্ত যেটাকে রেখে গিয়েছিলেন দমদমের একটা বাজে জায়গায়। শুনেছি তারপরও নাকি সমীরকান্তি আমায় দেখার জন্য দাদার ওখানে যাতায়াত করতেন। অত বড়লোকের ছেলের স্বপ্ন মা বোধহয় দেখতে তখন সাহস পাচ্ছিলেন না। বরং সমীরকান্তির কাছ থেকে আমায় দূরে রাখার প্রবণতা তাঁর দেখা দিল। এইরকম একটা সময়ে দমদমের বাড়িতে হুডখোলা গাড়িতে চেপে শিবনাথবাবুর সঙ্গে বিরাট চেহারার মানুষটি এলেন। গিলে করা পাঞ্জাবি, চুনট করা ধুতি পরা এই মানুষটি যে সমীরকান্তির বাবা তা চেহারা দেখে বোঝা অসম্ভব। বাড়িতে তখন মা আর আমি ছাড়া কেউ নেই। বাবার মৃত্যুর পর মাকে আড়ষ্টতা সরাতে হয়েছে। আধমাথা ঘোমটা টেনে মা ওঁদের সামনে দাঁড়ালেন। শিবনাথবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, সমীরকান্তির বাবার নাম পতিতপাবন রায়, বিরাট অ্যাটর্নি।

পতিতপাবন বললেন, 'সাধারণত আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বৈষয়িক আলোচনা করতে চাই না, কিন্তু যেহেতু আপনার স্বামী জীবিত নেই, তাই বাধ্য হচ্ছি। আমরা কেন এখানে এসেছি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন—'

মা ঘাড় নেড়ে না বললেন। ভেতরের দরজার আড়াল থেকে আমি দেখলাম শিবনাথবাবুর চোখ ঘুরছে। কী বিশ্রী চোখদুটো। পতিতপাবনবাবু কীরকম বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে উঠলেন, 'সেকী, বড়লোকের ছেলেকে ধরতে জাল ছড়িয়েছেন আর কারণটা বুঝতে পারছেন না—'

'আপনি কী বলতে চাইছেন?' মায়ের গলা ভীষণ শক্ত, আমি কখনও শুনিনি।

'আপনার মেয়েকে দেখতে চাই। পছন্দ হলে ছেলের বউ করব।' পতিতপাবন মায়ের মুখের দিকে তাকালেন।

'কেন?'

'আমি কারও কাছে জবাবদিহি করি না।'

'মেয়ে আমার। বিয়ে দেব কি না সেটা আমি ঠিক করব।'

'ও তাই নাকি। আপনাদের যা অবস্থা, পৃথিবী ঘুরলেও এরকম পাত্র পাবেন? পতিতপাবন রায় নিজে আপনার বাড়িতে এসেছে এটাই ভাগ্য বলে মনে করবেন।'

'আমি মনে করি সবার চিন্তা একরকম হয় না।'

মায়ের কথা শুনে আমি বোধহয় আর একটু হলে লাফিয়ে উঠতাম আনন্দে। মা যে এত সুন্দর কথা বলবে ভাবতে পারিনি। আমাদের বাড়িতে এসে কেউ খামোকা অপমান করে যাবে, এ কেমন কথা? আমি সাহস পাচ্ছিলাম না আর উঁকি মারতে, কিন্তু দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল।

পতিতপাবনের গলা কয়েক সেকেন্ড শোনা গেল না। কেমন একটা থম ধরা অবস্থা, কী হল যখন বুঝতে পারছি না তখন শিবনাথবাবুকে বলতে শুনলাম, 'তা হলে উঠুন, ফিরে যাই।'

'ফিরে যাওয়ার জন্য তো এখানে আসিনি শিবে। শুনুন, পৃথিবীতে আমি কারও নির্দেশ মেনে চলি না। আমার ছেলের শুনলাম আপনার মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। তার যে এত কম জ্ঞান আছে তাই আমার ধারণা ছিল না। এসব আমি সহ্য করতাম না। কিন্তু, আমি একবার মেয়েটিকে দেখতে চাই।' পতিতপাবনের গলার স্বর অনড়।

'কেন?'

'আমার প্রচুর টাকা। আমি মরে গেলে সেসব পাঁচভূতে লুটেপুটে খাবে। আমার বাড়িতে কোনও সুন্দরী মেয়ে নেই। আমার বংশধররা দেখতে একটু সুশ্রী হোক, আমি চাই। শুনেছি, আপনার মেয়েটি সুন্দরী, ভেবেই দেখতে এলাম।'

মা ভেতরে এলেন। আমি যে সব শুনেছি বুঝতে না পারার কোনও কারণ ছিল না। আমাকে কিছু বলতে বোধহয় মায়ের বাধছিল কারণ মা নিজের মনেই যেন বলল, 'ছেলেটা তো ভাল, একটুও অহংকার নেই। বাপ মা আর ক'দিন থাকবে।'

অতএব আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটুও সাজগোজ না করে এমনকী যে সাধারণ শাড়িটা তখন পরেছিলাম সেটা না পালটে ওঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিশাল মুখটা আমার দিকে দু'পলক তাকিয়ে থাকল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'নাম কী?'

বললাম। এই সময় শিবনাথবাবুর চোখের দিকে নজর গেল, কেমন হিলহিলে চাহনি।

'সমীরকান্তির সঙ্গে তোমার আলাপ আছে? সত্য কথা বলবে?'

আচমকা প্রশ্নটা শুনে আমি কেমন জবুথবু হয়ে গেলাম। উনি আমার দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে আছেন। কোনওরকমে ঘাড় নাড়লাম, না।

এর কিছুদিন পরেই আমার বিয়ে হয়ে গেল। সোনার গয়না নেই, মায়ের অবশিষ্ট একটা হার আর মামাতো ভাই-এর দেওয়া আংটিতে বিয়ের কনেকে সাজানো যায় না। তাই ফুলের গয়নায় সেজে আমার বিয়ে হল কালীঘাটের বাড়ি থেকে। সমীরকান্তির সঙ্গে পতিতপাবন আসেননি। এলেন শিবনাথবাবু বরকর্তা হিসেবে।

ফুলশয্যার রাত্রে সমীরকান্তি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সোনার গয়না পরার শখ আছে?'

মাথা নাড়লাম, না। একটু অবাক হলেন যেন, 'মেয়েরা শুনেছি গয়না পছন্দ করে খুব?'

আমি কিছু বললাম না, কী বলব?

কিছুক্ষণ বাদে নিজেই বললেন, 'ভালই হল তা হলে। আমার তো নিজের কোনও গয়না নেই যে তোমায় দেব, মা বাবার কাছ থেকে নিতে হত। যারা খুব গয়না পরে তাদের মনটা যেন কেমন হয়ে যায়।'

অথচ আমায় পরতে হল। এই মুহূর্তে আমি আপাদমস্তক গয়না পরে বসে আছি। আমার শ্বশুর লক্ষ্মীবাবুর দোকান থেকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে যত গয়না এনেছিলেন আমি জীবনে তার অনেকগুলোর নাম শুনিনি। শাশুড়ি সেগুলো দেখতে দেখতে কেন যে খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন প্রথমে বুঝিনি। শুধু বারবার চাপা গলায় বলছিলেন, 'আদিখ্যেতা।' পরে জেনেছি, ওর মধ্যে কয়েকটা নতুন ডিজাইনের গয়না ওঁর নিজের ছিল না এবং সেগুলো পরে আনিয়ে নিয়েছেন। আমার শাশুড়ি দেখতে সুন্দরী নন, মোটার দিকে ধাত, মুখ চোখ নাকে কেমন অন্যরকম ছাপ যা আমি আমার মায়ের মধ্যে দেখিনি। সেই যে বিয়ের পর এই ঘরে এসে ঢুকেছি একদিন ছাড়া বাইরে বেরুতে পারিনি। এমনকী দ্বিরাগমনেও নয়। ফাল্গুনের শেষে বিয়ে হয়েছিল, এটা চৈত্র মাস। এ মাসে নাকি বাড়ির বউ বাইরে রাত্রিবাস করতে পারবে না, সে বাপের বাড়ি হলেও। নিয়মকানুন এখানে বড় কড়া।

আমার স্বামী না বললেও আমি জানি এ বাড়ির মানুষদের সঙ্গে তাঁর একদম মিল নেই।

শ্বশুরমশাইকে কিছুটা বুঝতে পারি। রাগি, অর্থবান, সবাইকে নিজের অধীন ভাবা মানুষ। কিন্তু আর সবাই কেমন রহস্যময়। সুন্দরদা এ বাড়ির চাকর, কিন্তু এমন ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ান যে তা মনে হয় না। এমনকী একদিন সমীরকান্তি বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছি, সুন্দরদা ঘরে এসে চেয়ারে পা তুলে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বাপ নাকি এককালে খুব বড়লোক ছিল, সত্যি নাকি?'

রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। চাকরবাকরের এতটা স্পর্ধা হবে ভাবতে পারিনি। মুহূর্তে মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলাম, চাপা গলায় বলেছিলাম, 'চাকরবাকরদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া আমার অভ্যেস নেই।'

যেন এরকম কথা আশাই করতে পারেনি লোকটা। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে কিছু না বলে উঠে গেল। কিন্তু রাত্রে যখন সমীরকান্তি এসে বললেন, 'সুন্দরদাকে এ বাড়ির লোক ঠিক চাকর বলে ভাবে না, তুমি কি খুব খারাপ ব্যবহার করেছ?'

কী হয়েছিল বললাম। উনি নিজের মনেই উচ্চারণ করলেন, 'আর ভাল লাগে না।'

আমার একটি ননদ আছে। বিয়ের পর পর ও আমার ঘরে আসত খুব। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ওকে দেখতাম। শরীরটা মা বাবায় মেশানো, বুদ্ধি বোধহয় মায়ের মতনই। যা কথা বলত তাতেই হিংসের ঝাঁঝ। ওইটুকুনি মেয়ে, মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আমার কাছে জানতে চাইত। এ বাড়ি না হলে ঠাস করে চড়াতাম। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এখানে আমার বয়সি কেউ না থাকলেও ননদ যখন আছে তখন তাকেই বন্ধু করে নিই। কিন্তু দু দিন পরে জানলাম এ ঘরে আসার কারণ উত্তর দিকের ওই জানলায় স্রেফ দাঁড়ানো। লোকটাকেও দেখলাম। ফিড়িঙ্গি টাইপের চেহারা, সিনেমা লাইনে কাজ করে নাকি। দেখলেই বোঝা যায় ননদের বয়সের দ্বিগুণ ওর বয়স। আমার যে পছন্দ হচ্ছে না টের পেতে দেরি হল না ওর। সঙ্গে সঙ্গে নাক বেঁকিয়ে বলল, 'ও, নিজে পেটপুরে জল খেয়ে আমাকে গলা টিপে মারার ইচ্ছে, না? ভিখিরির মেয়ে তো আর কত হবে।'

স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। মনে হল এখনই এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। জানি না সদরে তালা আছে কি না, কিন্তু কেউ আটকাতে পারবে না আমাকে। এরকম অপমান সহ্য আমি কিছুতেই করতে পারব না। ননদ কথাটা বলে আর দাঁড়ায়নি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মন ঠিক করে ফেললাম। হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে। যাওয়ার সময় দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ননদ। এখন খুলতে গিয়ে দেখলাম সেটা বাইরে থেকে বন্ধ। অনেক চেষ্টা করে যখন খুলতে পারলাম না তখন রাগের মাথায় দুমদাম ঘা দিতে লাগলাম বন্ধ দরজায়। মিনিটখানেকের মধ্যে সমস্ত বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। শাশুড়ি যখন দরজা খুললেন তখন সামনে বাড়ির সব ঝি, সুন্দরদা, কিন্তু ননদ নেই।

'কী হল তোমার? দরজা ভাঙবে নাকি?' শাশুড়ি খিঁচিয়ে উঠলেন।

হঠাৎ আমার কী হল জানি না, এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে দেখে কেমন ঘাবড়ে গেলাম। মনের সব তেজ হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেল। কেমন অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকলাম।

'কী ব্যাপার, কথা নেই কেন? মাথার যে রোগ ছিল সেটাও চেপে গেছে তোমার মা?' শাশুড়ি গনগনে গলায় বললেন।

কোনওরকমে মুখ থেকে বের হল, 'বাথরুমে যাব।'

'অ। তাই বলো। এমন আওয়াজ করলে যেন পেটের ছেলে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছ, এসব ব্যাপারে যে ধৈর্য ধরতে হয় কেউ তা শিখিয়ে দেয়নি। ছ্যাঁ।'

আমি দেখলাম অন্য সবাই বেশ মজা পেয়েছে, ঝিরা মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে।

শাশুড়ি বললেন, 'যাও, কুকুর নীচে বাঁধা আছে। ভয় নেই।'

প্রয়োজন ছিল না, বাথরুমে দাঁড়িয়ে তবু কিছুক্ষণ কেঁদে এলাম।

সমীরকান্তিকে আমি ভালবেসেছি। কথাটা এমনভাবে বললাম যেন স্বামীকে ভালবাসা নতুন ব্যাপার। তা নয়, এ বাড়ির সব উদ্ভট মানুষগুলোর মধ্যে আমার স্বামী এমন জলের মতো পরিষ্কার হলেন কী করে কে জানে, জল পরিষ্কার হলে না ভালবেসে পারা যায়। কিন্তু ওঁর আচরণে একটুও উগ্রতা নেই, আদায় করার চেষ্টা নেই, বরং এমন একটা শান্তভাব আছে যে দু হাত ভরে দিতে ইচ্ছে করে। সেদিন দোলের রাত ছিল। এ বাড়িতে রং খেলার রেওয়াজ নেই। আমারও ভাল লাগে না। শুতে

এসে সমীরকান্তি বললেন, 'আজ খুব জ্যোৎস্না উঠেছে, জানো?'

এরকম কথা উনি বলেন না, মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এ ঘর থেকে তো দেখা যায় না। তবে আজ পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না তো উঠবেই।'

'কী আশ্চর্য, আমার খেয়ালই ছিল না। চলো, আমার সঙ্গে ছাদে চলো।' উনি হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো উচ্ছল হয়ে আমার হাত ধরলেন।

'কেন?' আমার শরীর শিরশির করছিল।

'ছাদে দাঁড়ালে সমস্ত কলকাতা শহর দেখা যায়। দেখবে কত জ্যোৎস্না।'

'কিন্তু মা যদি কিছু বলেন!' আমি এতটা স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারছিলাম না।

'এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আর আমরা তো কিছু অন্যায় করছি না।'

দরজা ভেজিয়ে উনি আমার হাত ধরে ছাদে নিয়ে এলেন। বিশাল ছাদ, অনেকটা দৌড়ানো যায়। উপুর করা কড়াই-এর মতো চাঁদটা থেকে জ্যোৎস্না যেন ছাদে গড়িয়ে এসেছে। দুদিন না কামানো দাড়ি, ধুতি আর সাধারণ শার্টেও ওঁকে কেমন রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল। সামান্য হাওয়া দিচ্ছে। আশেপাশের অনেকটা দেখা যাচ্ছে, কোথাও আলো জ্বলছে না। বিহারীরা হোলির গান গাইছে ঢোলক বাজিয়ে কাছেপিঠে। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে?'

কী বলব। শুধু ভাল বললে কী কিছু বলা হল? এই বাড়িতে আসার পর এই প্রথম নিশ্বাস নিতে পারছি সে কথা বলি কী করে। বললাম, 'আমার কথা থাক।'

উনি আমার দিকে চট করে একবার মুখ ফেরালেন, তারপর কেমন নিস্তেজ গলায় বললেন, 'আমার আর ভাল লাগছে না, এই বাড়ি আমাকে অষ্টপ্রহর গলা টিপে মারছে। তোমাকে বিয়ে না করলে হয়তো এতদিনে কোথাও চলে যেতাম।'

হঠাৎ কী হল জানি না সত্যি কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'পারতে?'

'পারতে হবেই। এখন পারছি না একদিন হয়তো—। কোনও জিনিস গড়ে উঠতে তিল তিল করে সময়ের প্রয়োজন হয়। তুমি আসার আগে নিজেকে মানুষ বলে ভাববার কোনও কারণ ছিল না। এ বাড়ির চারধারে পাপ, নোংরামি। আমি কী করব বুঝে উঠতে পারি না।'

ওঁর ভারী গলায় এমন একটা সুর ছিল যে আমি চমকে উঠলাম। মনে হল এই ফুটফুটে চাঁদের রাতে মানুষের দীর্ঘশ্বাস বড় কষ্টের। কথা ঘোরাতে চাইলাম, 'দ্যাখো, ওই সাদা মেঘটার গায়ে জ্যোৎস্না পড়ে মাছের মতো দেখাচ্ছে।'

একটু একটু করে আবার সহজ হয়ে গেলেন উনি। সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি গান গাইতে পারো?'

মাথা নাড়লাম, না। উনি বিশ্বাস করলেন না, 'যাঃ, মেয়েরা জন্মেই গান শিখে যায়।'

ওঁকে কখনও সিগারেট খেতে দেখিনি আগে, বললাম, 'ছেলেরা যেমন সিগারেট খায়।'

হেসে বললেন, 'না। আমি আজ প্রথম খাচ্ছি। এটা আমার তৃতীয় সিগারেট।'

'দেখছি তাই। একদম আনাড়ির মতো টানা হচ্ছে। আমি এর চেয়ে ভাল করে খেতে পারি।'

আমার ঠাট্টাটা উনি আঁকড়ে ধরলেন, 'ঠিক আছে, দেখি একটা টান দিয়ে দেখাও।'

মহাফ্যাসাদ তো। আমি আপত্তি করলাম, অনেক মাথা নাড়লাম, কিন্তু উনি কেমন জেদ ধরলেন, সিগারেট মুখে নিলে আমায় কেমন দেখায় দেখতে ইচ্ছে করছে। এইরকম ছেলেমানুষি মাঝে মাঝে ওকে পেয়ে বসে। কোনওদিন হাতেও ধরিনি, ভাবলাম খুব গম্ভীর মুখে এমনভাবে একটা টান দেব যাতে উনি হেরে যান। সিগারেটটা ওঁর হাত থেকে নিয়ে সামান্য টান দিয়েছি মনে হল দম আটকে গেল। প্রচণ্ড কাশি তো চোখে অন্ধকার দেখছি, কোনওরকমে ওটা ফেরত দিয়ে নিজেকে সামলাতে যখন হিমসিম খাচ্ছি ঠিক সেই সময় পায়ের আওয়াজটা কানে এল। কেউ একজন দুদ্দাড় পায়ে নেমে যাচ্ছে নীচে। সমীরকান্তিও শুনেছিলেন শব্দটা, চটপট উঠে সিঁড়ি অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলেন, 'কে এসেছিল বলো তো?'

কী কথা! যেন যে এসেছিল সে আমাকে জানিয়েছিল আগে। কিছু বললাম না। মনটা তেতো হয়ে গেল। আমরা ছাদে আসার পর থেকেই নিশ্চয়ই আমাদের ওপর নজর রাখা হয়েছে। একে যদি

নোংরামি না বলে তো আর কী তা হতে পারে। আমার স্বামী বোধহয় এই কথাটা একটু আগে বলেছিলেন। আর ভাল লাগছিল না। এই জ্যোৎস্না বিশ্রী লাগছিল। বোধহয় কোনও জিনিস আগে থেকে সুন্দর হয় না, মানুষের মন তাকে সুন্দর করে দেখে বলেই সে সুন্দর। আমরা নীচে নেমে এলাম। কেউ কোথাও নেই, যেন বাড়িটা অথৈ ঘুমে মগ্ন। কথা বলতে ভাল লাগছিল না। বিরাট খাটটার একধারে শুয়ে পড়লাম। সমীরকান্তি কিছুক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে কী ভাবলেন তারপর নিঃশব্দে নিজের জায়গায় শুলেন। আমার স্বামী বুঝতে পারেন আমাকে কখন একা থাকতে দেওয়া উচিত।

পরদিন সকালেই ডাক এল। ঝি এসে বলল সুন্দরদা খবর দিয়েছেন কর্তা আমাকে ডেকেছেন। অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম, ঝি বলল, 'দেরি করো না নতুন বউদি, কর্তা অপেক্ষা করতে পারেন না।'

ওর সঙ্গে নীচে নামলাম প্রথম। ঘোমটায় চিবুক নয়, কপাল ঢাকতে হয়েছে। বিয়ের পর যিনি কখনও ডেকে কথা বলেননি আজ সাতসকালে ডেকে পাঠানোর পেছনে একটাই কারণ থাকতে পারে, সেটা অনুমান করছিলাম। কিন্তু তার জন্য তো শাশুড়িই ছিলেন।

দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে ঝি ফিরে গেল। দেওয়াল জোড়া বই-এর আলমারি, ফাইলপত্র, তার মাঝে উনি বসে। গায়ে একটা ফতুয়া, বিশাল মুখটা আমার দিকে ফেরানো।

'গরিব ঘরের দেখতে শুনতে ভাল মেয়ে বলে তোমাকে এ বাড়িতে এনেছিলাম, বেলেল্লাপনা করার জন্য নয়।' ওঁর থমথমে গলা আমার পা অবধি জমিয়ে দিল। কী করব বুঝতে পারছি না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছি দেখে খানিক পরেই আবার গর্জে উঠলেন, 'উত্তর করছ না যে বড়?'

আমি দেখলাম আমার ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু কথা আসছে না।

'কাল মাঝরাতে ছাদে গিয়ে সিগারেট ফুঁকছিলে? এ অভ্যাস কত দিনের?' এবার সরাসরি প্রশ্ন।

'আমি খাইনি।'

'খাওনি? কাল রাত্রে খোকার সিগারেট টাননি? হারামজাদা কবে থেকে এ নেশা ধরল তাই বুঝতে পারছি না। বিয়ের পর নতুন নতুন গুণ হচ্ছে। আমার বাড়িতে এসব চলবে না। রোজগার করার মুরোদ নেই এক পয়সাও, বাপের ঘাড় ভেঙে নেশা করছেন বউকে নিয়ে। ওসব নিজের পয়সায় করতে হয় বুঝলে। তোমাকে বলে দিচ্ছি, এসব ব্যাপার আমার বাড়িতে আর চলবে না। মুখ দেখলে তো মনে হয় না ভেতরটা এরকম।' উনি কেটে কেটে কথা বললেন যাতে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। এতক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছিলাম, ভয় কমে যাচ্ছিল, ইচ্ছে হল মুখের ওপর প্রতিবাদ করি। ওঁর গায়ের-জোরী কথাবার্তায় যে ভুল সেটা বুঝিয়ে দিই। কিন্তু সেই সময় বাইরে কাশির শব্দ পেলাম। সে-ই আসছে। উনি একটা ফাইল হাতে নিয়ে বললেন, 'যাও, ভেতরে গিয়ে চা পাঠিয়ে দাও।' আমাকে দরজার দিকে তাকাতে দেখে চটপট জুড়ে দিলেন, 'আমার রোজগারে বাইরের লোককে গেলানো পছন্দ করি না। এক কাপই পাঠাবে।' এই সময় শিবনাথবাবুকে দেখলাম। আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েছেন মনে হল। আর দাঁড়ালাম না। আমাকে চা পাঠাতে কেন বললেন কে জানে। আমি তো এ বাড়ির রান্নাঘরটা কোথায় তাই জানি না। ঝিকে বলে দিলাম। এক কাপের কথা বলতে সে একগাল হেসে উত্তর দিল, 'ও আর বলতে হবে না গো। কর্তা বলেন, আমরা মাথা অবধি গিলব নইলে ফেলে দেব, কিন্তু খবরদার বাইরের লোককে নয়। আমার না থাকলে কেউ খাওয়াবে না।'

আমি খুব আস্তে বললাম, 'শিবনাথবাবু বাইরের লোক কি না জানি না তো!'

চোখ ঘুরিয়ে সে চাপা গলায় জানাল, 'এককালে এ বাড়ির ছোটকর্তা ছিলেন, এখন বাইরের লোক।' কী করে যে অমন হল জানি না। একজন মানুষকে সামনে বসিয়ে শ্বশুরমশাই খাবেন—বোধহয় এটাই এখানকার নিয়ম।

এতক্ষণ কোথায় ছিলেন জানি না, চারটে বাজার সামান্য আগে উনি আবার ফিরে এলেন। মনে পড়ল আমাদের আজ বাগবাজার না কোথায় যাওয়ার কথা। আমাদের মানে শ্বশুরমশাই সঙ্গে থাকবেন। সেখানে একজন বৃদ্ধা আছেন যিনি আমাকে দেখবেন। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এরকম তোড়জোড় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুধু দেখাবার জন্যে তা মনে হয় না। স্বামীকে জিজ্ঞাসা

করে জানলাম তিনি খুব ছেলেবেলায় ওই বৃদ্ধাকে দেখেছিলেন।

চারটে বাজতেই গাড়িটা এল। সমীরকান্তির ওই একই বেশ, একটু আগে শাশুড়ি খবর পাঠিয়েছেন আমি যেন ভিখিরির মতো না যাই, এ বাড়ির বউ বলে যেন আমাকে বোঝা যায়। ফলে এখন আমার অস্বস্তি হচ্ছে, হাত কান গলা জুড়ে সোনার ভার সহজ হতে দেয় না, নিজেকে কিম্ভূত লাগে। সমীরকান্তি আর আমি পাশাপাশি বসলাম। সুন্দরদা দরজা অবধি পৌঁছে দেবার নাম করে সেটা দেখে গেল। এই প্রথম আমরা একসঙ্গে বাইরে এলাম। যে ড্রাইভার চালাচ্ছে তার রোগা এবং বৃদ্ধ শরীর দেখলেই বোঝা যায় জোরে চালাবার অভ্যেস একদম নেই। হাজরার মোড়ে এসে সমীরকান্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কলকাতার রাস্তাঘাট চেন?'

হেসে মাথা নাড়লাম, 'না।' মাথায় কাপড়টা ধরে বললাম, 'এটাকে এখন নামিয়ে দেব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ঘোমটা দিয়ে থাকতে হবে না। আচ্ছা তোমাকে কলকাতাটা চিনিয়ে দিই। আমরা যদি সোজা যেতাম তা হলে ভাল হত। অনেক কিছু দেখাতে পারতাম, এদিকে গড়ের মাঠ আর চিড়িয়াখানার মুখ ছাড়া কিছু দেখা যাবে না।'

'সোজা যাবে না কেন?'

'সোজা গেলে বেশি রাস্তা ঘুরতে হয়, তেল খরচ হবে বেশি। বাবার সব হিসেব করা।'

হঠাৎ আমার কী হল সোজা প্রশ্নটা করে ফেললাম, 'আচ্ছা, নিজে রোজগারের চেষ্টা করলে হয় না?'

উনি আমার দিকে তাকালেন। দুটো বড় চোখের পরিষ্কার দৃষ্টি দেখলাম। তারপর হেসে বললেন, 'আমাকে রোজগার করতে দেওয়া হয়নি। তা হলে বাবা দিনরাত আমাকে খোঁটা দেবার সুযোগ পেতেন না যে—একটা মানুষকে কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।' তারপর কী ভেবে বললেন, 'কিছুদিন থেকে মাথার মধ্যে প্ল্যান ঘুরছে ব্যবসা করার, কী করে যে করব জানি না। কিন্তু একটা প্রেস আমায় কিনতেই হবে। মুশকিল হল, আমার হাতে টাকা পয়সা নেই।'

এত অসহায় লাগল ওঁর গলা কিন্তু আমি কী করব! আমার শরীরে এখন অনেক ভারী গয়না অথচ এগুলো আমার নয়। ফুলের গয়না পরে বিয়ে হয়েছিল যার তার কখনও সোনার গয়নায় অধিকার থাকতে পারে না। আমার যদি সামান্য কিছু থাকত এই মুহূর্তে ওঁকে দিয়ে দিতাম, আমার স্বামীকে রোজগেরে দেখতে আমি সব করতে পারি। কলকাতা শহরটা একটু একটু করে কখন পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে টের পাইনি, এই প্রথম আমরা একসঙ্গে বেরুলাম, অথচ বাইরে চোখ রাখা হল না। শেষ বিকেলের রোদ জানলা গলে আমাদের কোলে মুখে পড়েছিল, উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন গম্ভীর গলায় বললেন, 'গোপা, তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!'

মনে মনে বললাম, ছাই লাগছে, যে মেয়ে স্বামীর প্রয়োজনে এগোতে পারে না সে আবার সুন্দর কীসে। সাজানো চামড়া মাংসমাত্রই সৌন্দর্য নয়।

গাড়ি থামতেই শ্বশুরমশাইকে দেখতে পেলাম। বিরক্ত মুখ নিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন, নজর আমাদের দিকে। তাঁর পাশেই শিবনাথবাবু অদ্ভুত রকমের হাসিমুখ করেছেন, কিন্তু চোখদুটো আমার মুখের ওপর সাঁটা। গাড়িটা যে হাইকোর্ট পাড়ার চেম্বারের সামনে এসে গেছে ঠাওর করেননি সমীরকান্তিও।

পতিতপাবন গম্ভীর গলায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেরি হল কেন বিশে, খুব ঘুরে-টুরে তেলের শ্রাদ্ধ করে এলে নাকি!'

'না আজ্ঞে! আমি গিয়েছি আর এসেছি।' ড্রাইভার চটপট জবাব দিল।

'ঠিক আছে, তেল ফুরিয়ে গেলে তোমার মাইনে থেকে কেটে বাকিটা কিনব।' রায় দিয়ে আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন। এর মধ্যে খুলে রাখা ঘোমটা আবার টেনে দিয়েছি। এখন আমার নাক আর ঠোঁট চিবুক ছাড়া কিছু দেখা যাবে না। ঘোমটা দেওয়ার একটা সুবিধে, কেউ কিছু বললে উত্তর না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

'খোকা! নেমে এসে সামনে বসো।' পতিতপাবন যেন আর দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছিলেন না। ঘোষণা হওয়ামাত্রই সমীরকান্তি দরজা খুলে দ্রুত সামনের সিটে গিয়ে বসলেন। পেছনের বিরাট সিটে আমি একা। দেখলাম পতিতপাবন এদিকের দরজা খুলছেন। আমি একদম জানলা ঘেঁষে বসলাম। উনি

উঠতেই মনে হল গাড়িটা অনেকখানি নীচে নেমে গেল। স্প্রিংগুলো আর আগের মতো নাচছে না। শিবনাথবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পতিতপাবন বলে উঠলেন, 'আঃ, তুমি আবার কোথায় যাবে শিবে। এ আমাদের পারিবারিক ব্যাপার—তুমি বরং হেঁটে বাড়ি চলে যাও।'

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিতে এক পলকে দেখলাম শিবনাথবাবুর মুখ গনগনে উনুনের মতো হয়ে গেছে, দেখলেই বুক ছ্যাঁত করে ওঠে। সাধারণ মানুষের চোখে এরকম দৃষ্টি থাকে না।

কিছুটা দূর যেতেই শ্বশুরমশাই বললেন, 'সমানে সমানে সম্বন্ধ না হলে সংসার সুখের হয় না। মতিভ্রম হয়েছিল, কী আর করা যাবে। শোনো, বাড়ির বউ-এর সবচেয়ে বড় পরিচয় হল মাথার ঘোমটা। এরপর থেকে যেন ঘোমটা ছাড়া তোমাকে না দেখি।'

বুঝলাম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে উনি আমার মাথা লক্ষ করেছেন। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি কথা বললেন না শ্বশুরমশাই, এত সহজে অব্যাহতি পাব ভাবা যায় না। চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে উনি আবার কথা বললেন, 'বুঝলে, এতদিনে তোমার স্বামীর মনে হয়েছে যে তার বাবা তাকে মাইনেপত্র দিচ্ছে না, শুধু শুধু খাটিয়ে নিচ্ছে। উনি তাই ব্যবসা করবেন বলে আমাকে হুমকি দিচ্ছেন, আর আমার সঙ্গে বেরুবেন না। ভাল কথা, দেখি তোর মুরোদ কত, ব্যবসা তো আকাশ থেকে পড়ে না, তার জন্য টাকা লাগে, তা তুমি কিছু লুকিয়ে এনেছ নাকি বাপের বাড়ি থেকে?'

উনি জানেন সেটা অসম্ভব তবু বলার ঝোঁকটা সামলাতে পারেন না। ঘোমটা শুদ্ধ মাথাটা নেড়ে না বলা ছাড়া আমি কি করতে পারি!

'তা হলে? ব্যবসা করব! আরে সব যদি অত সোজা হত। পিঁপড়ের পেট টিপে মধু বের করতে পারিস? পারলে তোর ব্যবসা হবে।' কথাগুলো উনি যাঁকে শোনাতে চাইছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে কিন্তু বলছেন না। 'এই আমি কত লড়াই করে আজ এখানে এসেছি। মা তো জন্মের সময় চলে গেলেন আর বাপ নাকি সন্ন্যাসী হয়েছেন। সেই আমি আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি—এ পারার শক্তি তোর আছে?' কথাগুলো যেন কেমন কেমন! সমীরকান্তির দিকে ওঁকে আড়াল করে তাকালাম। সামনের আয়নায় ওঁর বিস্মিত মুখ দেখতে পাচ্ছি, বোধহয় কোনওদিন বাবাকে এ ধরনের কথা বলতে শোনেননি। ভর্ৎসনা আন্তরিক হলে স্পর্শ করা যায়।

যে বাড়িটার সামনে গাড়ি থামল সেটাকে সময় দিনরাত ঠোকর দিচ্ছে। বাইরের দিকে ইট বের করা, দরজা জানলায় রং শেষ কবে করা হয়েছিল কেউ বলতে পারবে না। ছোট গলির গায়ে দোতলা বাড়িটার দরজার দিকে এগোতে এগোতে শ্বশুরমশাই বললেন, 'এখানে আমি জন্মেছি, আমার জন্মস্থান।'

সমীরকান্তি আমার পেছনে, সামনে শ্বশুরমশাই। দরজাটা খোলাই, ঢুকে একটা চাতাল মতো পড়ল। নীচের ঘরগুলোয় খুব গরিব চেহারার কতগুলো ছেলেমেয়ে স্ত্রীলোক ঘুরছে। দেখলে বোঝা যায় এরা এক পরিবারের নয়, বোধহয় আলাদা ভাড়াটে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে পতিতপাবন চেঁচালেন, 'মা, মা।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ কেঁপে উঠল, 'কে—কে এলরে?'

শ্বশুরমশাই জবাব দিলেন, 'আমি গো, পতু, পতিতপাবন।'

একমুহূর্ত চুপচাপ, তারপরই ঝড় শুরু হল যেন, 'ওরে মুখপোড়া, ওরে বিষমুখো, আবার কেন এলি? আমি মরে গেছি কি না দেখতে—আমি অত অল্পে মরব না রে। তোর সকলকে মুড়ো ঝাঁটা মারি, লাথি মারি, যা চলে যা, দূর হ।'

কোনও পরিবর্তন হল না শ্বশুরমশাই-এর ভাবভঙ্গিতে। হেসে বললেন, 'একা একা থেকে মাথাটা' তারপর গলা তুলে বললেন, 'মনের শান্তি হয়েছে তো? তা এবার দরজাটা খোলো, দ্যাখো কাকে এনেছি।'

'কাকে আর আনবি? তোর সেই মরাখেগো শাগরেদ বাপমারা তান্ত্রিকটা নয় ডাইনি বউটা—দূর হ, দূর হ।' এত ঘেন্না কোনও গলায় ঝরতে পারে আগে জানতাম না।

এবার বোধহয় ধৈর্য রাখতে পারলেন না পতিতপাবন, আসল গলাটা বেরিয়ে এল, 'আঃ, তখন থেকে টিন পেটাচ্ছ, সাধ মেটাতে ছেলের বউকে নিয়ে এলাম দেখাতে উনি শুধু নামতা পড়ছেন। দেব বাড়ি

সুদ্ধ বিক্রি করে, তখন বুঝবে। দরজা খুলবে, না চলে যাব?'

'বিক্রি করবি? তা তো করবি। ভুলিয়ে ভালিয়ে মা বলে লিখিয়ে নিয়ে এখন তো বিক্রি করে লাথি মেরে তাড়াবি। অ ভগবান, আমার মরণ হয় না।' ডুকরে ওঠা কান্নাটা ছড়িয়ে পড়ল এবার।

হতাশ পতিতপাবনের পাশ দিয়ে এবার সমীরকান্তিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। ছেলেকে দেখে একটু সরে দাঁড়ালেন তিনি। দরজার কাছে গিয়ে সমীরকান্তি আস্তে আস্তে ডাকলেন, 'দি-দা, ও দি-দা, দরজাটা খোলো।'

কান্নাটা থেমে গেল, 'কে, কে ডাকে?'

'আমি খোকা, সমীরকান্তি।'

'খোকা? পতুর ছেলে? তুই এয়েছিস ভাই? সত্যি তো!' গলার স্বর আচমকা পালটে গেল। সমীরকান্তি বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

আস্তে আস্তে দরজাটা খুলল। কয়েকটা হাড়ের ওপর একটা ছোট থান জড়ানো, গায়ে কোনও জামা নেই, চুলগুলো মুড়িয়ে কাটা, থুথুড়ে এক বুড়ি কোটরে ঢোকা জ্বলজ্বলে চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকালেন, 'সত্যি তুই এলি ভাই, আয় ভেতরে আয়। তোর কথা কত শুনি, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।' প্রায় হাত ধরে সমীরকান্তিকে ভেতরে টানলেন বৃদ্ধা।

পতিতপাবন হাসলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, অত আদিখ্যেতা করতে হবে না। এদিকে তাকিয়ে দ্যাখো আর একজন আছেন।'

সন্দেহের চোখদুটো ঘুরে আমার ওপর এল। আমি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে নিচু হতেই কয়েক পা সরে গেলেন। সমীরকান্তির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর নতুন বউ?' বোধহয় উনি ঘাড় নেড়েছিলেন। হঠাৎ একটা কান্না উঠল। এক-একটা শব্দ আছে যা বুকের ভেতর থেকে উঠে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিতে পারে এ সেই রকম শব্দ। আমি কিছু বোঝার আগেই দুটো শীর্ণ হাত আমাকে জড়িয়ে ধরে অনর্গল কেঁদে যাওয়ার পর বলে উঠল, 'তুই এলি দিদি, কী দিয়ে তোর মুখ দেখব—আমার যে কিছু নেই, ওই হতচ্ছাড়া পতু আমাকে ভিখিরি করে দিয়ে গেছে। কী দিয়ে তোর মুখ দেখি!' কান্নাটা পাক খেতে লাগল।

শ্বশুরমশাই বললেন, 'এই যে বুড়িকে দেখছ বউমা, এর কাছেই আমি মানুষ হয়েছি। একটু বেশি চেঁচামেচি করে, কিন্তু মনটা ভাল। খোকা, তুমি আমার সঙ্গে এসো, বাড়িটা ঘুরে দেখি। এখন বিক্রি করলে অবশ্য বেশি দাম উঠবে না।' বলতে বলতে উনি নীচে নেমে গেলেন। সমীরকান্তিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবাকে অনুসরণ করতে দেখলাম।

কান্নার আওয়াজ এখন মৃদু, তবু গোঙানিটা উঠছে। আমি বুড়িকে বললাম, 'আপনি কাঁদছেন কেন, দিতে যে হবে, তার কী মানে আছে!'

'সেকী কথা দিদি! তুই হলি আমার নাতবউ, তোকে দেব না তো কাকে দেব? কিন্তু তোর শ্বশুরটা আমাকে ভিখিরি করে দিয়েছে রে। ওই নীচের ভাড়াটেরা যা দু পাঁচ টাকা ভাড়া দেয় তাতে পেট চলে। আমার মুখে আগুন দেবারও কেউ নেই যে।' হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ল, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ভেতরে। অভাবের ছাপ সমস্ত ঘরে সেঁটে আছে। বুড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটা লোহার বাক্সের তালা খুলে তা থেকে কাপড়ে জড়ানো কিছু একটা বের করে একগাল হাসলেন। পুরনো কাপড়ের মোড়ক খুলতে বের হল একটা চকচকে কাঁসার থালা। এত যত্নে সেটা রাখা যে ওতে মুখ দেখা যায়। আমার হাতে সেটা দিয়ে বুড়ি বলল, 'এই দিয়ে তোর মুখ দেখলুম। সব গেছে, এটা তোর জন্য বোধহয় বেঁচে ছিল।' এবার আমার প্রণাম উনি গ্রহণ করলেন। বিয়ের পর এই প্রথম কেউ আমাকে আন্তরিকভাবে কিছু দিল। কান্না সংক্রামিত হচ্ছিল। মাথায় হাত রেখে উনি বললেন, 'সাবিত্রীসমান হ দিদি। তোর স্বামী শুনেছি ভালমানুষ। তোর শ্বশুরটা চাঁড়াল, শয়তান, ওই তান্ত্রিক [illegible] শিবুটা ওকে শ্মশান করে দেবে। কিন্তু আমার একটা কথা শোন দিদি, কখনও কাউকে দুঃখ দিস না। ভগবান কোনও জিনিস বাকি রাখেন না, যা দিবি তাই তোকে ফিরিয়ে দেবেন।'

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। আমার শ্বশুর লোক ভাল নয় এটা অনুমানে বুঝেছি কিন্তু শিবনাথবাবু [illegible] জানতুম না। চট করে সেই চাইনিটার কথা মনে পড়ল।

বুড়ি আমাকে বসিয়ে বললেন, 'বাতাসা খাবি? মিষ্টি কেনার পয়সা নেই রে।'

আমি বললাম, 'আমার একটুও খিদে নেই, বরং আপনার কাছে গল্প শুনি।'

'গল্প।' মাথা নেড়ে একগাল হাসলেন উনি, 'কত গল্প মনে আসে। একটা জীবনে তো কম দেখলাম না। আমার তো ছেলেপিলে নেই, কর্তাকে বলতুম আবার বে করো। তা তিনি শুনতেন না। কী করে ছাই সময় কাটে, শেষে একঘর ভাড়াটে বসালেন। স্বামী স্ত্রী. কোনও ঝামেলা নেই। স্বামী স্কুলে পড়ায়, বউটা বড় ভাল ছিল রে। তোর মতন লক্ষ্মীমন্ত, এসব মেয়েরা কেন যে কষ্ট পায়! আমার সঙ্গে খুব ভাব ছিল। তা আমাদের নীচতলার তিনটে ঘর ওদের ছেড়ে দিলুম মাত্র দশ টাকা ভাড়াতে। বাইরের লোক এলে বুঝতেই পারত না ওরা ভাড়াটে। এখানে আসার পরপরই বউটা পোয়াতি হল। প্রথম বাচ্চা হবে, ওদের যা চিন্তা আমার যেন তার দশগুণ। তেল মাখানো, ভাল খাওয়ানো সব আমি করতুম। বাচ্চার কাঁথা, জামা সব সেলাই করে রেখে দিয়েছি। এর মধ্যে একদিন বোধহয় সামান্য ব্যথা উঠেছিল, বলেনি। হঠাৎ দেখি পায়খানা গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে কী চিৎকার। কাটা ছাগলের মতো চেঁচাচ্ছে সেখানে বসে। ব্যাটাছেলে দুজন হতভম্ব, কী করবে বুঝতে পারছে না, শেষে আমি গিয়ে দরজা ভাঙলুম। রক্ত দিয়ে যেন পায়খানা নিকোনো, কী দৃশ্য তোকে কী বলব দিদি! কোনওরকমে তুলে নিয়ে ঢেকেঢুকে দিলুম। ওর স্বামী ডাক্তার ডাকতে ছুটল, মনে হল পেটটা যেন নিচু নিচু লাগছে বউ-এর। এদিকে তিনি তখন দাঁতে দাঁত চেপে অজ্ঞান হয়ে আছেন আর সমানে রক্ত বেরুচ্ছে দেহ থেকে। কী মনে হতে ছুটলুম পায়খানায়। তখন তো আর সাহেবি পায়খানা হয়নি, উঁচু ঘরের তলায় টিন পাতা থাকত, মলে ভরে গেলে রোজ মেথর এসে সেটা পালটে দিয়ে যেত। ওপরে কিছু না দেখতে পেয়ে ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখি নীচের টিনের মধ্যে তিনি পড়ে আছেন। গলা অবধি মলে পুঁতে গেছে, মাথা আর একটা হাত ওপরে—এমন অবস্থা কান্নাও নেই। তখন যে জামাকাপড় ছাড়ব তার হুঁশ নেই, বাইরে বেরিয়ে এসে হামাগুড়ি দিয়ে তলায় ঢুকে তাঁকে টেনে বের করতে পরিত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিলেন। সারা শরীরে নোংরা মাখা, ঘেন্নায় নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। কোনওরকমে গরম জলে সেগুলো পরিষ্কার করে মার কাছে নিয়ে গেলাম। মায়ের পেট থেকে সোজা গুয়ের টিনে পড়লি—তখন কী জানতুম কপালে এই আছে। সেই রাত্রেই চোখ বুজল বউ। লক্ষ্মীছাড়ি আমার সারা জীবনের শত্রু হয়ে গেল। আমাকে মেরে ফেলার জন্য সে মরে গেল। নীচে পড়েছিল বলে কর্তা নাম রাখলেন পতিত, সেই থেকে পতিতপাবন। আমরা তো মুখ্যু মানুষ, বুঝি না, ভগবান ওর জন্মটাই ওইভাবে করিয়ে বোধহয় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বড় হলে কেমন হবে।'

নিশ্বাস ফেললেন বুড়ি। ঝাপসা চোখদুটো স্থির হল খানিক, তারপর বললেন, 'তো সেই ছেলেকে বুক দিয়ে বড় করলুম। ওর বাপ বউ মরার পর কোথায় যে চলে গিয়েছিল আজও খবর জানি না। একদিন কর্তাও চলে গেলেন। আমার কেমন রোখ চেপে গেল এটাকে মানুষের মতো মানুষ করবই। ঘরে টাকা নেই, গয়না বিক্রি করেছি আর পড়িয়েছি। আই এ বি এ পাশ করল, আইন পাশ করল। কিন্তু তদ্দিনে কাকের বাসায় কোকিল ডানায় জোর পেয়ে গেচে। নামকরা উকিলের শাকরেদ হয়ে তার মেয়েকে বে করে উঠে গেল এখান থেকে। যাওয়ার সময় দেখাও করেনি। সে মাগি হাড়বজ্জাত। ওই যে শিবে হতচ্ছাড়া, ওর সঙ্গে নষ্টামি করত। ভগবান আছেন না, তুই যেমন গোখরো সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করিস, তোর ঘরেও তেমন কালনাগিনী পাক খাচ্ছে। আমার সব ওকে লিখে দিয়েছিলুম, এখন খোঁজও নেয় না, একটা পয়সাও দেয় না। আজ যে তোকে নিয়ে এল, কেন এল কী জানি। নিশ্চয় কোনও মতলব আছে।'

এই সময় পায়ের আওয়াজে বুঝলাম শ্বশুরমশাই আসছেন। ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী গুনগুন করছ, অ্যাঁ?'

বুড়ি বললেন, 'তোর জন্মবৃত্তান্ত শোনালুম।'

'যত্ত সব বানানো গল্প। একদম বিশ্বাস কোরো না বউমা। হ্যাঁ শোনো, বাড়িটাকে এভাবে ফেলে রাখার কোনও মানে হয় না।' উনি যেন একটু ইতস্তত করলেন।

'কেন, এ বাড়ি নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন?'

'ভাবছি, পুরো বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন করে ফ্ল্যাট তৈরি করব। আজকাল ফ্ল্যাটের ভাড়া খুব বেশি।

তুমি কোথায় থাকবে ভাবছি। আমি বলি কী, বয়স তো হল, এবার কাশীতে গিয়ে থাকো। বিশ্বনাথের ভোগ খাবে, পুণ্য হবে।'

আবার আগের চেহারায় ফিরে গেলেন বুড়ি, 'দূর হ, দূর হ গুমেখো শয়তান, আমার রক্ত চুষে আবার আমায় তাড়ানোর মতলব। তোকে, তোকে আমি অভিশাপ দিলুম, মরার সময় তোর মুখে এক ফোঁটা জল দেবে না কেউ।'

'মড়ার সময় কে কী করছে জেনে আমার কী লাভ। পাগল।' শ্বশুরমশাই হাসলেন।

'ও এত গর্ব, এত অহংকার, আমি যদি সতীসাবিত্রী হই তা হলে ভগবান যেন তোকে পুত্রশোক দেয়—তুই জ্বলে পুড়ে মর।' পাগলের মতো মাথা নাড়ছিলেন বুড়ি।

আর আমি পাথর হয়ে গেলাম। শ্বশুরমশাইকে এই অভিশাপ দেওয়া মানে আমার কী সর্বনাশ করা বুড়ি বোধহয় চিন্তাও করেননি। কিন্তু কথাটা বলেই বোধহয় উনি বুঝতে পেরেছিলেন। দেখলাম দেওয়ালে মাথা ঠুকছেন আর বলছেন, 'এ আমি কী বললাম, আমার জিভ খসে যাক, ও ভগবান, আমার কথা তুমি কানে নিও না। মেয়েটার যে সারা শরীরে দুঃখ পাওয়ার চিহ্ন—হে ভগবান, বলার আগে কেন আমি মরলাম না?' দেখলাম রক্ত বেরিয়েছে কপালে।

শ্বশুরমশাই এবার রাগি এবং গম্ভীর গলায় আদেশ করলেন, 'বউমা, চলে এসো।' উনি নেমে যেতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার শরীর কাঁপছিল। কী মনে হতে গিয়ে ওঁর শরীরে হাত দিলাম। উনি হঠাৎ শান্ত হয়ে আমার দিকে রক্তাক্ত মুখ ফেরালেন, 'দিদিরে, ক্ষমা কর আমাকে। আমি সর্বখাকি, সবাইকে খেয়েছি। কী বলতে কী বললাম।'

'আমি যাই।'

'আয়, আর আমার মুখ দেখিস না।'

দরজার কাছে চলে এসেছি আবার ডাকলেন, 'শোন, তোর পেটে বাচ্চা এসেছে?'

ঘাড় নাড়লাম।

'খোকাকে নিয়ে ওই বাড়ি থেকে পালা। কোথাও যদি জায়গা না পাস এখানে চলে আয়। আসবি?' ভিখিরির মতো মনে হল ওঁকে।

নীচ থেকে শ্বশুরমশাই-এর গলা ভেসে আসতে আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। ফিরে আসার সময় গাড়িতে কেউ কোনও কথা বলল না। সমীরকান্তির দিকে তাকাচ্ছিলাম আমি শ্বশুরকে এড়িয়ে। কেমন গম্ভীর হয়ে আছেন, মুখটা ভীষণ ভার আর আমার বুকের মধ্যে সেই যে ঢিপ ঢিপ শুরু হয়েছে কিছুতেই থামতে চাইছে না। এই প্রথম কেউ আমাকে জানিয়ে দিল যে সমীরকান্তি ছাড়া আমার আপন বলতে পৃথিবীতে কেউ নেই।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম। সমীরকান্তিকে পতিতপাবন নীচের ঘরে থাকতে বললেন। আমার আঁচলের তলায় সেই কাগজে মোড়া কাঁসার থালাটা এতক্ষণ কারও নজরে পড়েনি। এখন সেটাকে কোথায় রাখব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই ঘরে আমি থাকি, কিন্তু আমার নিজস্ব বলে কোনও রাখার জায়গা নেই। থালাটা কোনওদিন ব্যবহার করতে পারব কি না জানি না, এই বাড়িতে সেটা কতটা সম্ভব হবে সন্দেহ আছে। এখানে আমাকে প্রতিটি পা অন্যের নির্দেশে ফেলতে হবে। কানের কাছে ফিসফিসে স্বরটা ফিরে এল, খোকাকে নিয়ে ওই বাড়ি থেকে পালা। কিন্তু কাকে নিয়ে পালাব?

একটু আগে শাশুড়ি এসেছিলেন। গয়নার শব্দ হতেই আমি সতর্ক হয়েছিলাম। সমীরকান্তি তাঁর বাবার সঙ্গে কথা শেষ করে এখনও আসেননি। ভেজানো দরজা ঠেলে শাশুড়ি ঢুকলেন। ডানদিকের ফরসা গালটা ঢোপর হয়ে আছে, জরদার গন্ধ বের হচ্ছে। একটা মানুষ যে অত গয়না পরতে পারে ওঁকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

ঘরে ঢুকে বললেন, 'ঘরটা যে নরক করে রেখেছ! মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছ আর পরিষ্কার করতে শেখনি? তোমার মা-ই বা কেমন! একটা জায়গা নেই যেখানে বসতে পারি।' ওঁর মুখটা কুঁচকে উঠল, 'খোকা কোথায়?'

মাথা নাড়লাম, জানি না।

'কিছুই তো জানো না, শুধু এই ঘরে বসে বসে গিললে চলবে? খোকাকে বলো, এবার

রোজগারপাতির চেষ্টা করুক। শুনলাম কর্তাকে মুখের ওপর বলেছে যে আর তাঁর সঙ্গে বেরুবে না। আমি ভাবলাম হয়তো শ্বশুরবাড়ি থেকে চাকরি-বাকরি করে দেবে। তারপর মনে পড়ল সেখানেই তো হাঁড়ি চড়ে না। ব্যাটাছেলে বাপের পয়সায় খাবে আর দিনরাত বউ-এর সঙ্গে ফুসুর ফাসুর করবে এটা ভাল দেখায় না, বুঝলে?'

আমি ঘাড় নাড়লাম, বুঝেছি।

খেঁকিয়ে উঠলেন উনি, 'তুমি বোবা নাকি গা? সাতকথায় শুধু মাথা দোলাও? আর হ্যাঁ, তোমার যে লাগানো ভাঙানো স্বভাব আছে তা জানতাম না।'

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। রাগে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছিল।

'তোমার শ্বশুর পাঁচজনের সামনে সিগারেট ফুঁকেছ বলে তোমাকে কী বলেছেন তার আমি কী জানি। খোকা আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করল যে, আমি কর্তাকে বলেছি কি না? তোর বউ নেশা করবে পাড়ার লোক দেখবে, কার মুখ চাপা দিবি? তা এতদিন তো কখনও খোকার মুখে কোনও প্রশ্ন শুনিনি, তুমি না লাগালে সে সাহস পায় কোথায়?'

'আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বলিনি,' কথাগুলো সত্যি কিন্তু সমীরকান্তি যে মায়ের কাছে জবাবদিহি চেয়েছেন জেনে আমার ভাল লাগছিল।

'খোকার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?'

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

'খোকা তো চিরকাল একটু ঢিলেঢালা, কম জোরি। পেটে ধরেছি কিন্তু ওর হাবভাব এমন যে নিজের ছেলে বলে মনে হয় না। কর্তা বলছিলেন চারধারে চুরিচামারি হচ্ছে, দিনকাল খারাপ, তোমার গয়নাগুলো আমাকে দাও, রেখে দিই।' হাত বাড়ালেন উনি।

আজ বাগবাজারে যাওয়ার জন্য পরে যেতে হয়েছিল, একটা একটা করে খুলে ওঁর হাতে দিয়ে দিলাম। সেগুলো আঁচলে বেঁধে জিজ্ঞাসা করলেন—'আর নেই তো? অবশ্য লিস্ট আছে, মিলিয়ে রেখে দেব। আর হ্যাঁ, সুন্দর বড় ভাল ছেলে। ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে বোকামি করবে। স্বামী হল মেয়েছেলের বেনারসির মতো, তাকে আটপৌরে শাড়ি করলে ইজ্জত থাকে না। সব কথা তাকে বলা ঠিক নয়।'

কী বলতে চাইলেন বোঝার আগেই উনি ফিরে গেলেন। ওঁর যাওয়ার খানিক বাদেই সমীরকান্তি এলেন। মুখ এখনও গম্ভীর। ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা এসেছিল?'

'আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে বলল?'

'জরদার গন্ধ পাচ্ছি।'

আমি অবাক হলাম। সমীরকান্তি সম্পর্কে লোকে যা ভাবে সেটা ঠিক নয় ভাবতে ভাল লাগছিল।

'তা হঠাৎ এ-ঘরে, কী বলল মা?' সমীরকান্তি স্পষ্ট চোখে তাকালেন।

'এমনি এসেছিলেন।' আমি ইতস্তত করলাম।

'এমনি? বিশ্বাস হয় না।'

'কিছু বললে লাগানো ভাঙানো হয়ে যাবে। বেনারসি শাড়িকে আটপৌরে করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই।' আমার কথাটা উনি বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। এটা একদম ভাল লাগছিল না আমার, তাই শেষ পর্যন্ত কারণটা বললাম, 'মা এসেছিলেন গয়নাগুলো নিয়ে যেতে, চারধারে চুরিচামারি হচ্ছে।'

'তাই বলো। মাঝে মাঝে এমন একটা কথা বলো যে মানে বুঝতে পারি না। তা গয়নাগুলো তো বাবা তোমায় দিয়েছিল, তুমি মাকে দিয়ে দিতে পারলে?'

'ওগুলো তো আমার নয়, দেব না কেন?'

'মায়া লাগল না, কষ্ট হল না?'

'একটুও নয়।'

'সত্যি বলছ?'

'আমি তোমার কাছে মিথ্যে বলব না।'

কথাটা শুনে উনি চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এত খুশি হতে ওঁকে আমি দেখিনি।

আমি উঠে গিয়ে কাগজে মোড়া থালাটা নিয়ে এসে বললাম, 'তোমার বাগবাজারের দিদা এটা দিয়ে আমার মুখ দেখেছেন।'

ভারী থালাটা হাতে নিয়ে উনি বললেন, 'বাঃ, কী করে আনলে দেখতে পেলাম না তো। এটা ব্যবহার করো না। যত্ন করে রেখে দিয়ো।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আজ আমার কিছুই ভাল লাগছে না। বাবার অফিসে আর যাব না ঠিক করেছি। ছেলেবেলা থেকে এত নোংরামো দেখেছি যে আর সহ্য করতে পারছি না। আজ একটা লোককে বাবা আর শিবুকাকা ঠকিয়ে দশ বারো হাজার আদায় করলেন। আমি আর পারছি না।'

'কী করবে ঠিক করেছ?' আমার কেন যে ভাল লাগছে জানি না।

'ব্যবসা করার ইচ্ছে হচ্ছে, একটা প্রেস করব। কিন্তু আমার হাতে যে পয়সা নেই। একটু আগে বাবা ডেকেছিলেন। বললেন, আমার ব্যবসার জন্য একটাও পয়সা দিতে পারবেন না। এখন থেকে নিজের রোজগার নিজে করতে হবে। জানো, আমার বাবা পৃথিবীতে টাকা ছাড়া আর কাউকে ভালবাসেন না। এখন ভাবছি কেন হঠাৎ তোমায় দেখে বিয়ে করার ইচ্ছে হল। আমার যে ইচ্ছে হতে পারে সেটাই এ বাড়ির কেউ বিশ্বাস করেনি প্রথমে। খামোকা তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে বিপদে ফেললাম।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় দরজায় শব্দ হল। সমীরকান্তি দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাই?'

ঝি-এর গলা পেলাম, 'কর্তা বউদিদিকে ডাকছেন।'

সমীরকান্তি বিস্মিত হয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও ঘুরে এসো।'

নীচে নামছি, ননদের সঙ্গে দেখা হল। অতবড় মেয়েকে শাশুড়ি যে কেন এখনও ফ্রক পরিয়ে রাখেন বুঝতে পারি না। শরীর বেঢপ দেখায়। আমায় দেখে চোখ ঘুরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কার সঙ্গে ঘরে বসে কথা কইছিলে গো?'

ভাবলাম বলি গিয়ে দেখলেই পারতে। বললাম, 'তোমার দাদা।'

'ওমা!' গালে হাত দিল সে, 'আজকাল বুঝি সন্ধে থেকেই।'

চড় মারবার জন্য হাত তুলেও নিজেকে সামলে নিলাম। আমার চেহারা দেখে ও বোধহয় অনুমান করেছিল, একটু দূরে সরে গিয়ে বলল, 'যাও, বাবা তোমার ডুগডুগি বাজাবে।'

কেন যে এরা এভাবে কথা বলে আমি জানি না। শ্বশুরমশাই— তিনি একরকম। কিন্তু শাশুড়ি বা ননদ, এঁদের সঙ্গে আমি কখনও সামান্য খারাপ ব্যবহার করিনি, তবু এঁরা কেন আমায় দুচোখে দেখতে পারেন না, ঠেস না দিয়ে কথা বলতে পারেন না, ঈশ্বর জানেন।

শ্বশুরমশাই ঘরে একা। ফতুয়া আর কাপড় পরে ইজিচেয়ারে শুয়ে দলিল-টলিল ধরনের কাগজ দেখছিলেন। এ ঘরে আমি কখনও আসিনি। এটা ওঁর শোওয়ার ঘর। পাশেই একটা সাদামাটা বিছানা পাতা আছে। ঘরে একটাই জানলা এবং তাতে মোটা লোহার শিক বসানো, এ ঘরের দরজাটাও অস্বাভাবিক রকমের আলাদা।

দরজায় দাঁড়াতেই উনি চোখ তুলে তাকালেন, 'এসো। ডাকলে তাড়াতাড়ি আসতে পারো না কেন? তোমাকে দেখে তো খুব একটা কাবলা বলে মনে হয় না।'

উনি আমার মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না, কারণ ঘোমটাটা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি। এরকম ভাবে একলা আমাকে কেন ডেকে পাঠালেন বুঝতে পারছি না।

'বাগবাজারের বুড়িকে কেমন লাগল?' সরাসরি প্রশ্ন।

কী বলব। ভাল বললে উনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন, মিথ্যে কথা বলতে খারাপ লাগছে।

'উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু কোনও জিনিসের বাড়াবাড়ি সেটার মূল্য কমিয়ে দেয়—এ কথাটা বোঝেন না বলেই এখন গালমন্দ করতে হয়।' নিজেই যেন উত্তরটা দিয়ে দিলেন শ্বশুরমশাই, 'হ্যাঁ, তোমাকে যে জন্যে ডেকেছি, তুমি খোকার কানে কী মন্ত্র দিয়েছ?' ওঁর চোখদুটো আমার দিকে।

মাথা নেড়ে বললাম, 'আমি কিছু বলিনি।'

'বলোনি? তা হলে সে সাহস পায় কোত্থেকে যে বলে কাল থেকে আর আমার সঙ্গে বেরুবে না?

ওর চরিত্র তো জানি। জন্মাবার পরই মেরুদণ্ডটা সরিয়ে রাখা আছে। বলছেন, ব্যবসা করবেন। এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, ব্যবসা করব বললেই হল? টাকা কে দেবে? আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, সে যদি আমার সঙ্গে না বের হয় তা হলে ঘরে বসিয়ে আমি খাওয়াতে পারব না। সে যা ইচ্ছে করুক, প্রতিমাসে আমাকে খাওয়া খরচ দিতে হবে, বুঝতে পারলে?'

উনি আমার দিকে চেয়ে আছেন দেখে বললাম, 'ওঁকে বলব।'

'বলো, অবশ্য বললে যে কী রাজকার্য হবে তা জানা আছে। তোমার গয়নাগুলো কেন খুলিয়ে রাখলাম অনুমান করতে পারো?'

মাথা নেড়ে না বললাম। কারণ চুরি-ডাকাতির কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। 'ওগুলো তোমার কাছে থাকলে খোকা তাই বেচে আমাকে খোরাকির টাকা দেবে। আমার খাবে আবার আমারই হাগবে, ওসব চলবে না। তুমি হয়তো ভাবছ যে তোমার শ্বশুর খুব নির্দয়, পাষাণ—এইসব। ভাবতে পারো, কিন্তু আমি মনে করি না পৃথিবীতে কোন সম্পর্ক স্বার্থ ছাড়া টিঁকে থাকে। ওসব স্ত্রী-পুত্রের সুড়সুড়ি আমার কাছে চলবে না।' কথা বলতে বলতে উনি চট করে একটা আঙুল ঠোঁটে রেখে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে ইঙ্গিত করলেন। ওঁর ভাবভঙ্গি দেখে আমি এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে উনি যখন নিঃশব্দে উঠে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তখন একটুও নড়তে পারিনি। আচমকা দরজার পাল্লা খুলে চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, 'এখানে কী করছ! অন্যের ঘরে আড়ি পেতে শুনতে লজ্জা করে না? এত বয়স হল তবু স্বভাব পালটাল না! তোমাকে আমি এ ঘরে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি খেয়াল নেই? নাকি আমাকে নিজের মতো ভাবছ? আমার ছেলের বউ মানে আমার মেয়ে, বোধহয় মেয়ের চেয়ে বড়। কারণ মেয়ে তো তোমার গর্ভে জন্মেছে। যাও।'

কথাগুলো কাকে বলছিলেন প্রথমে বুঝতে না পারলেও শেষটায় অপরিষ্কার থাকল না। শ্বশুরশাই-এর সঙ্গে শাশুড়ির সম্পর্ক কী ধরনের তা আমাকে কেউ বলেনি, আমারও কোনও কৌতূহল ছিল না। এখন আচমকা এ ঘটনায় আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। শ্বশুরমশাই আবার তাঁর জায়গায় ফিরে এসে বসেছেন, উত্তেজনায় এখনও তাঁর শরীর কাঁপছে। অনেক কষ্টে গলা থেকে স্বর বের করলাম, 'আমি যাই!'

উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়তে গিয়ে বোধহয় কিছু মনে পড়ে যাওয়ার মাথা সোজা করলেন, 'দরজাটা বন্ধ করো।'

এবার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল, উনি আমাকে দরজাটা বন্ধ করতে বলছেন কেন? হঠাৎই মনে হল শ্বশুরমশাই-এর চাইতে শাশুড়ি অনেক ভাল। যত ঠেস দিয়ে কথা বলুন না কেন, হাজার হোক তিনি তো মেয়েমানুষ। ভাবলাম এক ছুটে নিজের ঘরে ফিরে যাই অথবা মুখের ওপর প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমাকে সে সুযোগ না দিয়ে তিনি নিজেই দরজাটা বন্ধ করে জানলা ভেজিয়ে দিলেন, 'তুমি বড্ড অভবা মেয়ে, কথা বললে কানে নাও না কেন?'

শরীর এখন শক্ত, পায়ে জোর আসছে ফিরে, দেখলাম উনি একটা মোটা চাবির গোছা আমার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছেন, 'এটা ধরো।'

ধরলাম। বেশ ভারী লম্বা লম্বা চাবি।

'বাঁদিকের দেওয়ালটার কাছে যাও। দু হাত অন্তত চাবি ঢোকানোর গর্ত আছে। একটা একটা করে খোলো?' উনি আদেশ করলেন।

এবার কৌতূহল হচ্ছিল আমার। দেওয়ালের মধ্যে চাবির গর্ত—তার মানে ওখানে লুকনো আলমারি আছে? এখান থেকে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শক্ত পা ফেলে দেওয়ালটার কাছে গেলাম। মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে ছোট ছোট চাবির গর্ত, চট করে কিছুই বোঝা যায় না। আমার এই হতভম্ব ভাবটা বোধহয় ওঁর নজর এড়ায়নি, আত্মতুষ্টির গলা শুনতে পেলাম, 'এক বুড়ো মুসলমান মিস্ত্রিকে দিয়ে বিশেষভাবে ওটা তৈরি, আমি ছাড়া কেউ জানে না এর খবর। কারণ মিস্ত্রিটা মরে গেছে। এবার খোলো। ডানদিক থেকে চাবিগুলো সাজানো আছে পর পর।'

সত্যি ডানদিকের চাবিটা প্রথম গর্তে ঢুকিয়ে সামান্য ঘোরাতেই একটু শব্দ হল। কোনও হাতল নেই, চাবিটা ধরে সামান্য টানতেই পাতা খসে যাওয়ার মতো চৌকো একটা পাল্লা খুলে এল। পাল্লার রং আর

দেওয়ালের রং একদম এক। এমনকী ওর জোড়গুলো এত সূক্ষ্ম যে চট করে বোঝা যায় না। পাল্লাটা সম্পূর্ণ খুলে গেলে চমকে উঠলাম, বান্ডিল বান্ডিল টাকার নোট গর্তটাকে প্রায় বুজিয়ে দিয়েছে। এত টাকা আমি কখনও দেখিনি। পেছন থেকে হুকুম শুনলাম, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? পরেরগুলো খোলো।'

একটার পর একটা সিন্দুক খুললাম, প্রতিটি একই রকমের নোটে ঠাসা। প্রথমটা খোলার সময় যে চমক ছিল শেষটা খুলতে যাওয়ার সময় আর সেটা থাকল না। বোধহয় বেশি দেখলে আর কৌতূহল থাকে না। কিন্তু এই এত টাকা, আমার শ্বশুরমশাই-এর এই টাকা তিনি আমাকে দেখাচ্ছেন কেন? উনি ছাড়া আর কেউ যখন এই টাকার খবর জানে না তখন সেটা আমাকে দেখানোর দরকার কী!

'পৃথিবীতে একটি মাত্র জিনিস যাকে আমি ভালবাসি সেটা হচ্ছে ওগুলো। আমার কষ্ট হলে ওরা আমাকে দেখবে, ওদের জন্যে মানুষ আমাকে ভয় করে। তাই আমি ওদের কমতে দিই না, ওদের বাড়াতে চাই, এই সিন্দুকগুলো ভরে গেলে আরও সিন্দুক খুলতে হবে আমাকে।' কেমন অপ্রকৃতস্থ লাগল ওঁর কথাগুলো। ঘোমটার আড়ালে ওঁর দিকে চাইলাম। উনি চোখে বুজে কথাগুলো বলছিলেন নিজের ঘোরে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওঁর গলার স্বর বদলে গেল, 'ওখানে কত টাকা আছে গুনে বলো আমাকে। বান্ডিলগুলো মাটিতে নামাও।'

আমি অসহায়ের মতো ওঁর দিকে তাকালাম, এত টাকা আমি কখনও গুনিনি। এগুলো গুনতে অনেক সময় লাগবে যে! উনি আবার বললেন, 'সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না।'

মেঝেতে বসে বান্ডিলগুলো খুললাম। দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট। এত টাকা আমি গুনব কী করে? কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমি জানি শ্বশুরমশাই তাঁর আদেশ ফিরিয়ে নেবেন না। কোনও প্রতিরোধ নেই, আমার বুক থেকে কান্না উঠে আসছিল। খুব কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। না, কোনও দয়া ভিক্ষা করব না, সব নোট গুনে প্রমাণ করব এটাও আমি পারি।

একটা একটা নোটের বান্ডিল গুনছি আর নতুন একটার হাত দিচ্ছি। হঠাৎ মনে হল আমার পিঠের ওপর যেন কিছু ফুটছে। অস্বস্তিটা এত বেড়ে গেল যে ঘাড় না ফিরিয়ে পারলাম না। শ্বশুরমশাই এখনও নিজের চেয়ারে বসে আছেন কিন্তু তাঁর শরীরটা এদিকে বাড়ানো, দুটো চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে উনি নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন। এরকম লোভী আত্মতুষ্টি এবং ঘিনঘিনে চোখ আমি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলাম না।

কিছুক্ষণ পরই আমার হাত কনকন করতে লাগল। আঙুলের ডগায় ব্যথা করছে, অথচ অর্ধেকও গোনা হয়নি আমার। একটু থেমে থাকলে অথবা অন্যমনস্ক হলে হিসেবটা গুলিয়ে যাবে। গুনতে শুরু করার পর আমি একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিলাম। এক হাজার হয়ে গেলেই সেগুলোকে একটা জায়গায় আলাদা করে রাখছিলাম যাতে পরে ওই এক একটা তাড়া গুনে পুরো সংখ্যাটা পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ কায়দাটা বদলাতে হল। এক হাজারের তাড়াগুলো রাখতে এত বেশি জায়গা লাগছে যে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠব না। বাধ্য হয়ে দশ হাজারে নিয়ে গেলাম তাড়াগুলো। ক্রমশ হাত আঙুল ব্যথা হওয়া সত্ত্বেও আমাকে নেশায় পেয়ে বসল। এটা গোনার নেশা। শেষ না হওয়া পর্যন্ত যার শান্তি নেই। এর মধ্যে কখন যে সময় পার হয়ে গেছে আমার খেয়াল নেই। একটা জেদও নেশাটাকে টান টান করে রাখছিল। এর মধ্যে শ্বশুরমশাই আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেননি, আমিও আর ওঁর দিকে ফিরে তাকাইনি।

শেষ টাকাটা গোনা হয়ে গেলে মনে হল এগুলোকে ঠিক মহামূল্যবান অর্থ বলে মনে হচ্ছে না, যেন দেওয়ালের নীচে একরাশ কাগজ ডাঁই করা আছে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম কোমর টনটন করছে, কপালে ড়ুঁই ড়ুঁই ঘাম। একটা একটা তাড়া যখন গুনে শেষ করলাম তখন আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

এই সময় শ্বশুরমশাই-এর গলা পেলাম, 'মা লক্ষ্মীর কত দয়া হয়েছে?'

কখন যে ঘোমটা খসে গিয়েছিল টের পাইনি। ওঁর দিকে অবাক হয়ে চাইলাম, প্রশ্নটার মানে কী? মায়ের দয়া বলে যা জানি এটা কী সেরকম কিছু! তারপরই মানেটা মাথায় এল, উনি টাকার পরিমাণটা জানতে চাইছেন।

বললাম, 'নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশো দশ টাকা।' সংখ্যা বলতে গিয়ে আমি হাঁফিয়ে উঠলাম। কী

ভীষণ ভারী।

চোখ বন্ধ করলেন উনি, তারপর নিজের মনেই বললেন, 'এখনও উনসত্তর হাজার দুশো নব্বুই টাকা বাকি। হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। মিলিওনিয়র।' তারপর আমার দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে বললেন, 'আর একবার গোনো।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। উনি কী পাগল হয়ে গেছেন। একবার গুনতেই মনে হচ্ছে আমার শরীর আর বইছে না, ফের গুনতে গেলে নিশ্চয়ই মরে যাব। আমি কি ভুল গুনেছি? এত টাকা যিনি যত্নে রেখেছেন তাঁর কাছে নিশ্চয়ই হিসাব আছে। সেটা কি মিলছে না! উনি আবার চোখ বন্ধ করলেন, যেন কিছুই হয়নি। কেউ ওঁর কথার অবাধ্য হবে এটা কল্পনাতেও নেই। 'আমি আর পারছি না!'

আমার কথা শুনে উনি যেন চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাঙালি বউদের পারছি না কথাটা উচ্চারণ করা পাপ, তা জানো?'

আমি এবার মরিয়া, ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না।'

'এমন বাড়িতে জন্মেছে যে কোন সহবত শেখায়নি। মেয়েরা, প্রকৃত সতীরা আমৃত্যু আদেশ পালন করে যায়। টাকা হচ্ছে বড় আদরের জিনিস, বড় অভিমানী। তাকে রাখতে হয় যত্ন করে। একবার গুনলে তার অসম্মান হয়। তোমার তো ভুল হতে পারে, তাই দুবারে শুধরে নাও। আমি অবাধ্যতা একদম পছন্দ করি না।' রায়টা এমনভাবে ওঁর মুখ থেকে বের হল যেন আচমকা কেউ আমার চারপাশ লোহার বেড়ায় ঘিরে দিল। সেটা ঠেলে বেরিয়ে আসব এমন শক্তি আমার নেই। ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে আবার গুনতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর মনে হল খামোকা গুনছি কেন? যদি প্রথমবার ভুল করে থাকি তা হলে এবার যদি সেটা ধরা পড়ে তবে কোনটা ঠিক তা ঠাওর করার জন্য উনি যে আবার গুনতে বলবেন না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বরং প্রথম সংখ্যাটা বলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ কথা তো ঠিক, প্রথমবার আমি একদম ফাঁকি দিইনি, নিজের অজান্তে যদি ভুল হয় সেটা স্বতন্ত্র। গোনার ভান করে গুনতে গিয়ে দেখলাম কষ্ট হচ্ছে না। বোধহয় গোনার জন্য যে মানসিক চাপ থাকে সেটা শূন্য হয়ে যাওয়ায় সহজ হচ্ছে। কিন্তু দ্রুত কিছু করলে ওঁর সন্দেহ হতে পারে সেটাও মনে রাখতে হচ্ছে। এই যে ওঁর আদেশ শুনছি না—এ বাড়িতে বোধহয় একেই বিদ্রোহ বলা যেতে পারে।

একটু তাড়াতাড়ি শেষ হল, মনে না গুনলেও হাত চালাতে হচ্ছিল, এখন আর সেটা আমার কাঁধের সঙ্গে জোড়া নেই বলে মনে হচ্ছে। শ্বশুরমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত গুনলে এবার?'

'নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতশো দশ টাকা।' অম্লান বদনে মিথ্যে কথা বললাম।

'ঠিক আছে। প্রথমবারও ঠিক ছিল, দ্বিতীয়বারেও সঠিক হল, এবার ওগুলোকে যত্ন করে তুলে রাখো। অবহেলা করে রাখবে না, ওদের যত্ন করতে হয়।'

বান্ডিল খোলার পর টাকাগুলোর চেহারা যেন ফেঁপে গেছে বেশ, ঢোকাতে কষ্ট হচ্ছিল। সিন্দুকের খোপগুলো সব ভর্তি হয়ে গেল। একটার পর একটায় চাবি দিলাম। এখন উঠে দাঁড়াতে শরীর টলছে। কোনওরকমে চাবি ওঁর সামনের টেবিলে রাখলাম।

উনি সেটা খপ করে তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজলেন, 'সব টাকা স্বস্থানে আছে তো?'

আমার চোখ ফেটে এবার জল বেরিয়ে এল।

উনি হাসলেন, 'টাকার গায়ে একটা অদৃশ্য আঁটা লাগানো থাকে। কখন যে কার হাতে সেঁটে যায় বলা যায় না। আচ্ছা, এবার তুমি যেতে পারো।' যদি দৌড়ে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম, দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনিতে হাত রেখেছি আবার ওঁর গলা পেলাম, 'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি, এখানে কত টাকা আছে, কোথায় কী ভাবে আছে তা পাঁচজনকে জানাবার প্রয়োজন নেই, এমনকী খোকাকেও নয়। বুঝতে পারছ?'

আমি ঘাড় নাড়লাম, এ ঘর থেকে যেতে পারলেই বাঁচি।

'এতই যখন বোঝ তখন এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এত লোক থাকতে তোমাকে ডেকে কেন আমি টাকা গোনালাম, সব দেখিয়ে দিলাম।' হাসলেন উনি।

না, আমি জানি না, আর একথা স্বীকার করলেও উনি আমার জন্যে আর একটা জ্বালা ধরানো ঠাট্টা

করবেন। সত্যি, আমাকে দেখানোর কী কারণ থাকতে পারে? ওঁর এই সব গোপন অর্থ উনি এত লোক থাকতে আমাকে ভালবেসে দিয়ে যাবেন বলে দেখালেন—অতি বড় পাগল সে কথা বিশ্বাস করবে না। ভাবলাম বলি, এটা আপনার খেয়াল।

'কী, মুখে বাক্য নেই কেন? তোমাকে বলেছি না, প্রশ্ন করলে উত্তর না পাওয়া আমি পছন্দ করি না।' অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বললেন উনি। অবশ্য খুব সহৃদয়তার সঙ্গে কথা বলতে আমি দেখিনি।

'আপনার ইচ্ছে হয়েছে, তাই।'

'হ্যাঁ ঠিকই, ইচ্ছে হয়েছে তাই দেখালাম। কিন্তু কেন ইচ্ছে হল, আউট অফ অল পার্সেন তোমাকে ডেকে দেখালাম। সব কিছুর পেছনে একটা কারণ থাকে। কারণটা হল তুমি তো জীবনে টাকা দ্যাখোনি তাই তোমাকে দিয়ে অ্যাতো টাকা গোনালাম, লাখ লাখ টাকায় তুমি হাত দিলে। জীবনে এ সৌভাগ্য তোমার হত না, আমি সে সুযোগ দিলাম। যার প্রচুর টাকা আছে আর যে টাকা কখনও দ্যাখেনি, এই দুজনকে টাকা দিয়ে বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু যে একবার টাকার স্বাদ পেয়েছে তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করি না, রক্তখেকো বাঘের মতো অবস্থা তাদের। তোমার শাশুড়ি সেইরকম একটা জিনিস। যাও।'

দরজা খুলে বাইরে এলাম। বিরাট চাতালটায় টিম টিম করে আলো জ্বলছে। ঢং ঢং করে ঘড়িতে দশটা বাজল। এ বাড়িতে যে কেউ জেগে আছে তা বোঝার উপায় নেই, ঝিগুলোকেও চোখে পড়ল না। পা টেনে টেনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। দোতলায় উঠতেই ডাক পেলাম, 'বউমা, এই ঘরে এসো।'

আজ অবধি শাশুড়ি আমাকে কখনও তাঁর ঘরে ডাকেননি। যখনই কথা শোনাবার দরকার মনে করেছেন আমার ঘরে এসেছেন। রান্নাঘর তো দূরের কথা আমাকে খাওয়ার ঘরে আজ অবধি খেতে দেওয়া হয়নি। ঘরেই খাবার পৌঁছে দেয় ঝি। এখন ডাকটা আসতেই বুঝতে পারলাম ঝড় আসছে। একটু আগে নীচে শ্বশুরমশাই-এর ঘরের দরজায় যে ঘটনা ঘটেছে তার জের টেনে উনি যে আমায় নাস্তানাবুদ করবেন সে কথা স্পষ্ট। শ্বশুরমশাই-এর কাছে যা পারিনি, মনে মনে সেটা করার জন্য তৈরি হলাম। এখানে এসে অনেক সহ্য করেছি, চুপ করে থেকেছি, অদ্ভুত একটা ভারী পাথর ক্রমশ আমার ওপর এমন চেপে বসছে যে এবার যদি সেটাকে ঠেলে না সরিয়ে দিই তা হলে পাগল হয়ে যাব। মুখ শক্ত করে পরদা সরিয়ে শাশুড়ির ঘরে ঢুকলাম।

বিরাট ঘরের দেওয়াল জুড়ে নানান ঠাকুর দেবতার বাঁধানো ছবি। তেত্রিশ কোটি দেবতাকে এক পলকে দেখে নিয়ে সামনে তাকালাম। ঘরের মধ্যিখানে একটা বিরাট পালঙ্ক। তার এক ধারে শাশুড়ি বাবু হয়ে বসে আছেন। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি, গায়ে ঘটি হাতা ব্লাউজ। ওঁর মাথাটা সামনে একটু নামানো, পেছনে সুন্দরদা উবু হয়ে বসে আছে। সুন্দরদার হাতের মুঠোয় শাশুড়ির দীর্ঘ চুলের গোছা। চট করে ঠাওর করিনি। এখন বুঝতে পারলুম যে সুন্দরদা শাশুড়ির চুল বেঁধে দিচ্ছে। নিজের চোখকে আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। একটা পুরুষ মানুষ একদম মেয়েদের ভঙ্গি করে হেলে দুলে দক্ষ হাতে চুল বেঁধে দিচ্ছে আমার কল্পনার বাইরে। বাড়িতে এতগুলো ঝি থাকতে শাশুড়ি সুন্দরদাকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছেন দেখে আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। কোনও পুরুষের যদি সম্পূর্ণ মেয়েলি স্বভাব হয় তা হলে তাকে সহ্য করা যায় না।

সুন্দরদা চিরুনি থামিয়ে শাশুড়িকে বলল, 'তোমার বউমা এসেছে।'

'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া এ বাড়িতে চলবে না বউমা, তোমার এত বড় সাহস যে আমি বেঁচে থাকতে তুমি শ্বশুরের ঘরের দরজা বন্ধ করো?' খ্যান খ্যান করে উঠল শাশুড়ির গলা। কী বলব বুঝতে পারলাম না। মনে হল এঁরা সবাই অসুস্থ, ঝগড়া করার কোনও মানে হয় না। নইলে সর্বাঙ্গে ওরকম বিকটভাবে গয়না পরে একজন ঘিনঘিনে মানুষকে দিয়ে কেউ চুল বাঁধাতে পারে? নজরে পড়ল আমার কাছ থেকে খুলে আনা একটা হার এখন ওঁর গলায় উঠেছে। এ ঘরে বোধহয় চুরি চামারি হয় না।

একদম উত্তেজিত না হয়ে জবাব দিলাম, 'আপনি তো নীচে গিয়েছিলেন, তখন শ্বশুরমশাইকে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না?'

'তখন দরজা বন্ধ ছিল না। ছি ছি ছি, এত লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত শ্বশুরের দিকে হাত বাড়ালে। আমি বেঁচে থাকতে সেটা সম্ভব হবে না, বুঝলে? আমার রাগ উনি জানেন। খুকি হবার পর একদিন

এমন একটা কথা বলেছিলেন যে তারপর থেকে আর এই ঘরে ঢুকতে দিইনি। এখন বোধহয় তাই কুটকুটুনি শুরু হয়েছে, ছ্যা!'

ওঁর মুখের দিকে তাকালাম। থ্যাবড়াটে মুখে ধারালো ঈর্ষা জেঁকে বসেছে। আমার মাথায় এখন ঘোমটা নেই, ঘাড় উঁচু করে বললাম, 'ছেলেবেলা থেকে জানতাম শ্বশুরমশাইকে বাবা বলতে হয়, এখনও তাই জানি। উনি আমাকে দিয়ে ওঁর জমানো টাকা গোনাচ্ছিলেন, তাই দরজা বন্ধ ছিল।' শ্বশুরমশাই-এর আদেশটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম ওই মুহূর্তে, শাশুড়ির ঘৃণ্য কথাগুলোকে একটু আড়াল করার এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

'টাকা গুনছিলে? ওমা, কীসের টাকা, ও ঘরে আবার টাকা আছে নাকি, ও সুন্দর, শুনছো বউ-এর কথা। তা কত টাকা গুনলে?' চোখ বড় হল ওঁর।

'সেটা বলা নিষেধ আছে।'

'নিষেধ? মানে কর্তা বলেছেন আমাকে না বলতে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা! তা টাকাগুলো কোথায় আছে শুনি?'

'সেটাও বলতে পারব না।'

'ও। সাধে কী বলেছিলাম ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছ, তা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে কেন, রাত তো শেষ হতে অনেক বাকি?' মাথাটা স্প্রিং-এর পুতুলের মতো দোলালেন শাশুড়ি।

'আমার ঘরে স্বামী আছেন। শ্বশুর আমার বাবার মতন। আর আমি চাকরকে চাকর বলেই জানি।' এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এলাম ওই ঘর থেকে। উনি বোধহয় শেষ কথাটা একটু দেরিতে বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা কানে এল, 'গুমর ভাঙবে লো গুমর ভাঙবে। ভিক্ষে করে খেতে হবে একদিন, রাস্তার লোকে ও শরীরে থুতু দেবে। যৌবনের বড্ড গুমর।'

সুন্দরদার খিক খিক হাসি শুনলাম, 'শরীর বলতে তো পাটকাঠি, তোমার মতো শস্য শ্যামলা হলে না কী দেখতাম বউদিমণি।'

আর দাঁড়ালাম না। কয়েক পা হাঁটতেই মনে হল কে যেন সট করে অন্ধকারে সরে গেল। আড়ি পেতে এ বাড়িতে আর কে শুনতে পারে আমার জানা হয়ে গেছে। দীক্ষা ওর হয়ে গেছে, আর কিছু করার নেই।

নিজের ঘরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ কাঁদতে লাগলাম। না, আর কোনও ভদ্রতা নয়, এ বাড়িতে আমার একমুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। সমীরকান্তির সামনে চোখে জল নিয়ে আমি কখনও দাঁড়াব না, নিজেকে ঠিক করে নিতে একটু সময় লাগল।

৩

আমার বিয়ের কথা হচ্ছিল। শোভাবাজারের কিংবা ফড়েপুকুরের মিত্তির বাড়ি বাবাকে কত টাকা দেবে তা নিয়ে শিবুকাকা দর কষাকষি করছিলেন। এই সময় আমি সাহস করে বাবাকে বলে ফেললাম গোপার কথা। কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন উনি, যেন আমার কথা বুঝতে পারছেন না। শেষতক বললেন, 'বাপের অবস্থা কেমন?'

মাথা নিচু করে বললাম, 'জানি না। শুনেছি তিনি নেই।'

'অ। তুমি চিনলে কী করে?'

'আমার বন্ধুর বোন।'

'তাই নাকি। লভে পড়েছ?' খ্যানখেনে হাসিতে কথাগুলো জড়ানো।

মাথা নিচু করেই বললাম, 'আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি।'

'তাই নাকি!' কী ভাবলেন খানিক, 'ঠিক আছে শিবেকে পাঠাচ্ছি, তবে কোনও ভিখিরির মেয়েকে আমি ঘরে আনতে পারব না।'

কিন্তু তবু গোপা এল। এটা কী করে সম্ভব হল জানি না, বোধহয় শিবুকাকাই বাবাকে রাজি

করিয়েছিলেন। এ বংশের মানুষগুলোকে সুন্দর চেহারায় দেখতে বাবারও বোধহয় বাসনা আছে। গোপা এল ফুলের গয়না পরে আর আমার তো একটা গেঞ্জি কেনার সামর্থ্য নেই। এই অবস্থায় কী যে করি। প্রেসের ব্যবস্থা করতে গেলে টাকা লাগবে। একটা পরিচিত মুখ মনে পড়ছে না যে আমাকে টাকা দেবে। কী যে করি।

চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। গোপা কখন ফিরে এসেছে টের পাইনি। আমার বুকের ওপর ওর হাতের ছোঁয়া পেয়ে, চোখ খুললাম। গোপার মুখ ফোলা ফোলা, চোখ ভারী। হাসার চেষ্টা করল, 'ঘুমুচ্ছিলে?'

মাথা নাড়লাম।

'খাবে না? ওঠো।'

'খেতে ভাল লাগছে না।' কথাটা সত্যি।

'রাত্রে না খেয়ে থাকতে নেই।'

আমি খপ করে ওর ডান হাত চেপে ধরে সেটায় ভর করে উঠতে যেতেই গোপা চাপা আর্তনাদ করল। অচমকা শব্দটা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হল?'

কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিচ্ছে গোপা, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরেছে। আর্তনাদটা তখনও ঘরের মধ্যে পাক খাচ্ছে যেন, তবে মনে হয় এই ঘরের বাইরে যায়নি। 'তোমার হাতে কিছু হয়েছে?'

দাঁতে ঠোঁট চেপে গোপা বলল, 'একটু, এমন কিছু নয়।'

কিন্তু এখন সেটা বিশ্বাস করা যায় না। আমি খুব আস্তে ওর হাত ধরলাম। ফরসা, চাঁপার মতো আঙুলগুলোকে এখন লালচে দেখাচ্ছে এবং একটু ফোলা ভাব। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী করে হল?'

গোপা বলল, 'নাই বা শুনলে। সব কথা শোনা উচিত নয়, ওতে অশান্তি বাড়ে।'

'তুমি আমার কাছে চেপে যাচ্ছ!'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কারণ শুনে তুমি কিছু করতে পারবে না।'

কথাটা একটু আগের অনুভূতিটাকে ফিরিয়ে দিল। আমি যে অপদার্থ সে কথা গোপা ও জানিয়ে দিচ্ছে। ওর চোখের দিকে তাকালাম। আমি জানি গোপা যদি বলতে না চায় তা হলে শত চেষ্টা করেও আমি তা শুনতে পাব না।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গোপা হাসল, 'শরীরের আঘাত চিরকাল সাময়িক হয় যদি সেটা মারাত্মক কিছুতে না দাঁড়ায়। এ নিয়ে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। এখন ওঠো, খেয়ে নাও।'

চুপচাপ বসে ও আমার খাওয়া দেখল। এ বাড়িতে খাওয়ার বিলাসিতা নেই, খেতে ইচ্ছেও ছিল না, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। দেখলাম গোপা সারা ঘরে ঘুর ঘুর করছে। রোজ আমার খাওয়ার পর ও খেতে বসে। বললাম, 'খেয়ে নাও।'

ও হেসে বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো তো।'

'কী ব্যাপার?' এবার আমার চোখের দিকে তাকাল গোপা, 'আমার খুব—মানে খেলে বমি হয়ে যাবে।'

কদিন থেকেই ওর অম্বলের বাতিক শুরু হয়েছে। প্রায়ই দেখি জোয়ান খায়। ভাবলাম আজও বোধহয় সেই রকম। গোপাকে আমি বুঝতে পারি না।

আলো নিবিয়ে ও আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। এই খাটে তিনজনের জায়গা হয়। গোপার মা এই একটি জিনিস আমাদের দিতে পেরেছেন, না হলে আমার পুরনো তক্তাপোশটায় আমাদের শুতে হত।

কোথা এক ফালি আলো আসায় অন্ধকার গাঢ় ছিল না, ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। বুকের মধ্যে যে পাথরটা সবসময় চাপ হয়ে থাকে সেটাকে নড়াবার জন্যই বললাম, 'আমাকে বিয়ে করে তোমার ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল, কী যে করলাম।'

ওর চাপা টুকরো হাসি কানে এল, 'পরকালের কথা জানি না, ভাবিও না, ইহকালটা তো নিজেদের হাতে, তাই না? তুমি সত্যি কাল থেকে বাবার সঙ্গে বেরুবে না?'

'না। আমি আর পারছি না।'

'ব্যবসার কথা কী ভাবলে? একটা কিছু উপায় করো।'

'কারও কাছে টাকা ধার করব, কার কাছে করি তাই ভাবছি। পটুয়াটোলায় একটা প্রেস বিক্রি আছে বলে শুনেছি।'

'কী রকম দাম?'

'জানি না। হাজার কুড়ি তো হবেই।'

'কুড়ি হা-জা-র।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার সত্যি ভাগ্য খারাপ। যদি বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে তা হলে ব্যবসার জন্যে চিন্তা করতে হত না। আমার যে কিছুই নেই।'

হেসে বললাম, 'সারাজীবন এ বাড়ির একমাত্র ছেলে হয়েও উপেক্ষা আর অবহেলায় কাটালাম এখন বড়লোক শ্বশুর সহ্য হত? ভগবান তাই ঠিক যা হওয়া উচিত সেই ব্যবস্থাই করলেন।'

'তাই যদি হয় তা হলে সাধারণ চিন্তা করতে পারো না কেন? তুমি গ্র্যাজুয়েট, চেষ্টা করলে একটা মাস্টারিও তো পেতে পারো!'

কথাটার মানে আমার মাথায় স্পষ্ট হবার আগেই কেন জানি না মুখ ফিরিয়েছিলাম। আর সেই সময় জানালায় আমার চোখ পড়ল। জানলার কাচে একটা এবড়ো—খেবড়ো মুখ চেপে রয়েছে। তার দৃষ্টি আমাদের খাটের দিকে। হঠাৎ একটা ভয় বুকের ভেতর চলকে উঠলেও খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিলাম। না, ভূত নয়, কেউ একজন লুকিয়ে আমাদের লক্ষ করছে। শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে গেল। জীবনে যা কখনও হইনি এই মুহূর্তে আমি তাই হয়ে গেলাম। গোপাকে কিছু না বলে তড়াক করে খাট থেকে নেমে দরজার দিকে ছুটে গেলাম। অবাক হয়ে গোপা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল, ছিটকিনি খুলতে একটু দেরি হয়ে গেল। দরজা খুলেই বাইরে পা দিয়েছি যখন, তখন মূর্তিটা অনেক সময় পেয়ে গেছে। তবু তার ভারী শরীরটা আবছা অন্ধকারে আমার চোখ এড়াল না। চিৎকার করে হাঁক দিলাম, 'কে ওখানে, দাঁড়াও, দাঁড়াও বলছি।'

আমার গলা থেকে এরকম স্বর বের হবে ভাবতে পারিনি, কিন্তু যে এসেছিল সে তখন বারান্দার বাঁকে মিলিয়ে গেছে। পেছন ধাওয়া করেও কাউকে দেখতে পেলাম না। এদিকের অনেকগুলো ঘরের যেকোনও একটায় যদি সে ঢুকে যায় তা হলে ধরা সম্ভব নয়।

আমার গলার স্বর এত চড়া ছিল যে নীচের আলো জ্বলে উঠল। বাবার গম্ভীর গলা শুনলাম, 'কী হয়েছে কী? রাত দুপুরে চেঁচাচ্ছে কে?'

ততক্ষণে ঝিগুলো বেরিয়ে এসেছে নীচে। আমি দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'আমি। এখানে কেউ একজন এসে জানলা দিয়ে আমার ঘরে উঁকি মারছিল। এতো নোংরা স্বভাব যে আমি বেরুতেই পালিয়ে গেল।' উত্তেজনায় আমার গলা কাঁপছিল।

'উঁকি মারছিল? তোমার ঘরে? এত রাত্রে তোমরা কী করছিলে?' বাবার প্রশ্নটা শুনে আমি হকচকিয়ে গেলাম। এটা কী ধরনের প্রশ্ন। চেঁচিয়ে বললাম, 'আমরা শুয়ে ছিলাম।'

'আস্তে কথা বলো। পাড়ার লোককে না জানালে চলছে না? কে উঁকি মেরেছে দেখেছ?' উনি ঘাড় উঁচু করে আমার দিকে তাকালেন।

'মুখ দেখিনি। মোটাসোটা শাড়ি পরা চেহারা।'

'ঠিক আছে, নিজের ঘরে যাও।'

'কিন্তু আপনার বাড়িতে এরকম নোংরা ব্যাপার হচ্ছে আর আপনি কিছু বলছেন না!' এই প্রথম আমি যেন বাবাকে চ্যালেঞ্জ করলাম।

'তুমি যখন চিনতে পারনি তখন কিছুই করার নেই। তুমি যদি বুঝতে পারতে তা হলে দেখতে কিছুই করার থাকত না। যাও।'

এই সময় মায়ের গলা শুনলাম, 'রাতদুপুরে একটু ঘুমোব তারও জো নেই। এত চেঁচামেচি কীসের?

বলি এটা গৃহস্থ বাড়ি না বাজার?'

মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। চেহারাই এতক্ষণে চোখের ওপর ছিল, মুখটা বুঝতে পারিনি, এবার স্পষ্ট হল। ঘেন্নায় আমার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছিল। বাবা নিজের ঘরে ফিরে গেছেন। ঝিগুলোর মুখ কেমন হাসি হাসি, যেন থিয়েটার দেখছে।

পেছন থেকে গোপার গলা শুনতে পেলাম, 'ঘরে এসো, অনেক হয়েছে।' আমি কী করব ঠিক করতে পারছি না, সরাসরি মাকে প্রশ্ন করলে কেমন হয়। চাপা গলায় গোপা বলল, 'কী হল! তুমি ঘরে না এলে আমি বেরিয়ে যাব।'

সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগল আমার। ঘুরে দাঁড়িয়ে টান টান জেদি এবং অসম্ভব সুন্দর মুখটার দিকে তাকালাম। তারপর আস্তে আস্তে ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'আজকের রাত আমার এই বাড়িতে শেষ রাত। কাল আমি কোথাও চলে যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে গোপা?'

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকল গোপা। দুটো চোখ আমার মুখের ওপর স্থির, ঠোঁট সামান্য ফাঁক, মাথা একপাশে হেলানো। ওর শরীরের কোথাও কম্পন নেই। এ এমন একরকম চাহনি যা আবিষ্ট করে রেখে দেয়। তারপর একটু একটু করে হাসি ফুটল ঠোঁটে। ছোট্ট একটা ভাঁজ অনেক কথা বলল। এইটে সহ্য করা আমার পক্ষে খুব শক্ত, হাসিটা আমাকে কি ঠাট্টা করছে? নিজের অস্তিত্ব দৃঢ় করতে আবার প্রশ্ন করলাম, 'কি, যাবে না?'

ধীর পায়ে বিছানার পাশে ফিরে গেল গোপা, 'তুমি কী বলছ তা জানো?'

'আমি কিছু জানতে চাই না এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।—ব্যস।'

'এ বাড়ি থেকে চলে গেলে তোমার বাবা তোমাকে ক্ষমা করবেন? ওঁর এত বড় সম্পত্তি তুমি হারাতে পারো, সেটা ভেবেছ?' গোপার গলা স্বাভাবিক নয়, কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা জ্বালা আছে যেটা আমার কান এড়াল না।

'আমি যখন চলে যাব তখন সব ছেড়েই চলে যাব। কিন্তু তোমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?' একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমার কথা!' হাসল, 'মাথা গরম করো না। এখন উত্তেজনায় যেটা সহজ মনে হচ্ছে কাল সকাল হবার পর সেটা খুব শক্ত অসম্ভব মনে হতে পারে।'

দ্রুত কাছে গিয়ে ওকে আমার দিকে ফেরালাম, 'তুমি আমায় এত ঠুনকো লোভী আর মেরুদণ্ডহীন ভাবো? গোপা, আমি তোমাকে—।' কথা যে এমন করে বুকের মধ্যে ডুবে যায় এই প্রথম আবিষ্কার করলাম।

'ছিঃ! অমন করে কথা বলো না। তোমাদের এই বিরাট বৈভব, এই নিরাপত্তা এসব আমার জন্যে চিরকালের জন্য হারাবে—লোকে তো আমাকে দায়ী করবে। বলবে আমি তোমাদের ঘর ভাঙলাম।'

'ঘর! ঘর কোথায় যে ভাঙবে! একটা চালার তলায় আমরা আছি যার দেওয়াল নেই। আমরা আমাদের জন্যে যাচ্ছি।'

'তুমি কষ্ট সহ্য করতে পারবে তো! অভাব কী তা তো জানো না, বাস্তব ভীষণ শক্ত, বড় নির্মম।'

'তোমাকে পাশে পেলে আমি সব পারব। এবার বলো?'

গোপা মাথা নিচু করল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আমি ওকে খোঁচা দিলাম, 'অবশ্য বাবার দেওয়া গয়নার ওপর যদি তোমার কোনও লোভ থাকে তবে অন্য কথা।'

অদ্ভুত হাসল গোপা, একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি এখনও ছেলেমানুষ!'

'তা হলে মুখ ফুটে কিছু বলছ না কেন?'

আমার দিকে দুটো টলটলে চোখ তুলে গোপা বলল, 'তুমি কিছু বুঝে নিতে পারো না? সব কিছু মুখ ফুটে বলতে হবে? আগে থেকে চুক্তি করে না নিলে বুঝি সুখ নেই? যে, নৌকো আছে কি না না জেনে নদীতে দু পা বাড়িয়ে দিয়েছে তাকে তুমি পারের লোভ দেখাচ্ছ?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মানে?'

এখন আমার বুকের ওপর গোপার কপাল গাল চিবুক। ফিসফিসিয়ে ও কথা বলছে, 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এ বাড়ির খাবার আর খাব না। এত অপমান আমি সহ্য করতে পারছি না গো! আজ রাত্রের

খাবার তাই মুখে দিতে পারিনি।'

আজকের রাতে আমার আর ঘুম আসবে না। অনেক চেষ্টা করলাম, চোখ বুজে পড়ে থাকলাম এতক্ষণ, কিন্তু ঘুমের দেখা মিলল না। আজ পর্যন্ত কখনও এরকম হয়নি। এতদিন বিছানায় পড়লেই চোখ বুজে আসত। পরিবর্তনটা কি এখনই শুরু হয়ে গেল! এক হাত দূরে গোপা শুয়ে আছে, জানি না ও ঘুমুচ্ছে কি না, অনেকক্ষণ ওর সাড়া পাইনি।

কাল সকালে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কোথায় যাব জিজ্ঞাসা করেছিল গোপা, কোনও প্রস্তুতি না থাকায় কোনও উত্তর দিতে পারিনি তখন। এতক্ষণ ধরে সেই কথাই ভাবছিলাম, কোথায় যাওয়া যায়! কলকাতা শহরে আমার কোন আত্মীয় নেই যে তার বাড়িতে উঠব। গোপার দাদা কিংবা মায়ের কাছে যেতে পারব না, আমার বাবা মায়ের ঠাট্টার গলাটা তা হলে সে-অবধি পৌঁছাবে। আমার নিজস্ব টাকা পয়সা নেই যে হোটেলে-ফোটেলে গিয়ে উঠব। মনে পড়ল আমার এক সহপাঠী বিকাশের কথা। ডায়মন্ডহারবার লাইনে মগরা বলে একটা জায়গায় ও আছে, অঙ্কের মাস্টার। আমাকে অনেক করে যাওয়ার জন্য বলত, এখন গেলে কেমন হয়! ওকে ধরে ওর স্কুলে যদি মাস্টারি পাওয়া যায়—ব্যাপারটা চিন্তা করেই সমস্ত শরীর পুলকিত হল। মনে হচ্ছে আমি যেন মাস্টারি পেয়েই গেছি।

জানলার দিকে তাকালাম। ওপাশের বারান্দাটায় কোনও শব্দ নেই। এখন এই বাড়ি ঘুমের মধ্যে ডুবে আছে। কাচটার দিকে কিছুক্ষণ তাকাতেই সেই মুখ মনে পড়ল। কাচে ঠেকে থাকা মানুষের মুখ কী বীভৎস দেখায়! কী দেখতে এসেছিল মা? আমি জানি না এর আগে আমাদের দেখেছে কি না জানলা দিয়ে। কিন্তু কতটা রুচিবিকৃতি হলে এই জিনিসটা হতে পারে। মায়ের সঙ্গে আমার কথা খুব কম হয়, হয়ই না বললেই চলে। ওই শরীর থেকে আমি জন্মেছি, ছেলেবেলার প্রথম দিকটা ওঁর আদরে বড় হয়েছি। মা শব্দটা প্রত্যেক সন্তানের বুকের অহংকারের মতো, কিন্তু আমার কিছুই হয় না। চোখ বন্ধ করলেই আমি সেই দৃশ্যটা দেখতে পাই যা আজও কাউকে বলতে পারিনি। গোপাকে বলা হয়নি, নিজের বিশ্রী ক্ষতের কথা কাউকে ডেকে বলতে ঘেন্না হয়।

এই বাড়ি তখনও দোতলা হয়নি। বাবা দিনরাত হাইকোর্ট পাড়ায় পড়ে আছেন, সঙ্গে শিবুকাকা। শিবুকাকা বিয়ে—থা করেননি, চিতপুরে একা ঘর ভাড়া করে থাকেন। কিন্তু ভোর না হতে সেই যে এ বাড়িতে চলে আসেন ফেরেন রাত গভীর হলে। শিবুকাকাকে বাবা পছন্দ করেন কারণ ওঁর একটা বিষয়ে দক্ষতা আছে। কলকাতা শহরের অনেক বড় তান্ত্রিকের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে। এ বাড়িতে একবার উনি একজন তান্ত্রিককে এনে যজ্ঞ করিয়েছিলেন। আমি তখন খুব ছোট। তারপর থেকে বাবার নাকি উন্নতি আরম্ভ হল। শিবুকাকা নিজেও এখন তন্ত্র সাধনা করেন। আমি ঠিক ব্যাপারটা বুঝি না, তবে কেউ কেউ বলে তান্ত্রিকরা ইচ্ছে করলে মানুষের ক্ষতি করতে পারে, শিবুকাকাকে আজকাল সবাই ভয় করে, অবশ্য বাবা ঠিক—।

শিবুকাকা তখন বাড়ির বাজার থেকে আমাদের স্কুলের মাইনে দিয়ে আসা কোনও কাজ বাকি রাখতেন না। উনি যে বাইরের লোক তা অনুভব করতাম না। স্কুলের খুব নিচু ক্লাসে পড়ি তখন। বোনের বয়স বছর দুয়েকের। মণিদি বলে একজন মহিলা বাড়িতে কাজ করতেন, তিনিই আমাকে স্কুলে দিয়ে আসা—করতেন। সেদিন কী কারণে একটা নাগাদ স্কুল ছুটি হয়ে গেল। মণিদির জন্য তিনটে অবধি অপেক্ষা না করে আমি অন্য ছেলেদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম। এটা সেই বয়সে এমন একটা মজার ব্যাপার যে বাড়ির সবাইকে চমকে দেবার ইচ্ছেয় কাউকে জানান দিলাম না। সদর দরজা বন্ধ। ওপাশের গলি দিয়ে জমাদারের আসবার একটা রাস্তা ছিল তখন, সেটাই বেছে নিলাম। কিন্তু ওপথে এলে বাড়ির চাতালে ঢোকার সময় মণিদির নজরে পড়বেই, খুব সন্তর্পণে এসে বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে চারপাশে লক্ষ করে বুঝলাম ওখানে কেউ নেই। বাথরুমে জল ঢালার শব্দ হচ্ছে, রান্নাঘরের দরজা বন্ধ। মণিদিকে খুঁজতে আশেপাশে ঘুর ঘুর করেও দেখা পেলাম না। এখন মা নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে, রোববার দুপুরে সেইরকম দেখেছি। মাকে চমকে দেবার জন্য পা টিপে টিপে বারান্দাটা পেরিয়ে এলাম। মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। আলতো করে চাপ দিলেও খুলল না। একটু ঘুরে জানলাটার নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাটি থেকে বেশ উঁচুতে জানলা, আমি একটু লাফিয়ে শিক ধরে ফেলে দেওয়ালের খাঁজে পা রেখে মাথাটা জানলার ওপরে তুলে হনুমানের মতো যেই ডেকে উঠেছি অমনি দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। শিবুকাকা

আর মা শুয়ে আছে, কারও গায়ে জামা কাপড় নেই। পূর্ণবয়স্ক নারীপুরুষের নগ্ন শরীর এর আগে আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু ওই মুহূর্তে সেটা কী বীভৎস দেখাল। আমার শব্দ শুনে দুজনে চমকে দুপাশে সরে যেতে যেতে জামাকাপড় নিয়ে নিজেদের ঢাকাঢাকি করতে লাগল। খুব অল্প সময় কিন্তু আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। আমি ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মণিদির চিৎকার শুনতে পেলাম, 'ওমা, এ ছোঁড়া বাড়ি এল কী করে! ও খোকা, ওখানে কী করছিস।' মণিদি দৌড়ে এসে আমাকে ধরে টানতে-টানতে ওপাশের বারান্দায় নিয়ে গেলেন, 'কী করছিস জানালায় উঠে, অ্যাঁ?'

আমি বুঝতে পারছিলাম যে খুব অন্যায় কিছু করে ফেলেছি। একা একা স্কুল থেকে আসা, সেটা ভীষণ অন্যায়। তারপর জানলায় উঠে হনুমান-ডেকেছি। ক্রমশ ভয় আমাকে পেয়ে বসছিল। বার বার মায়ের দরজার দিকে তাকাচ্ছি, দরজাটা তখনও খোলেনি। মণিদি তখন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন, সবই আমাকে অভিযুক্ত করে। এই সময় ভেতর থেকে মায়ের চাপা গলা শুনতে পেলাম, 'আঃ চুপ কর। ওটাকে বাইরে নিয়ে যা।'

নিজের কপালকে হাজার গালাগালি দিতে দিতে মণিদি আমাকে সদর খুলে বাইরে নিয়ে এলেন। দুপুরের রোদে খাঁ খাঁ করছে চারধার, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না মণিদি। আমাদের বাড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'হতভাগা ছেলে, তুই কী করলি বল দেখি!'

'আমি আর করব না।' অপরাধের কূলকিনারা না পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠলাম।

'যা করেছিস তার কী আর—', বলতে বলতে থেমে গিয়ে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'জানলায় উঠে কিছু দেখিসনি তো?'

আর তখনই সেই দৃশ্যটা আবার দেখতে পেলাম যেন চোখের সামনে। এতক্ষণ মণিদি যে উত্তেজনা আমার ভেতরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাতে ও ব্যাপারটার কথা খেয়ালে ছিল না। আমার মা এবং শিবুকাকা ওরকম ভাবে শুয়েছিলেন কেন? এটা যে খুব গোপন ব্যাপার এবং আমার দেখতে নেই এই বোধ এতক্ষণে আমার হয়ে গিয়েছে। মণিদির প্রশ্নের জবাবে ঘাড় নাড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভেতর থেকে কেমন একটা শব্দ ছিটকে বেরিয়ে এল, 'মর মর। আমি আর কতকাল এই পাপ সামলাব। ওসব দেখার আগে নিজের দু চোখ গেলে ফেলতে পারলি না খোকা।'

'এইসময় শিবুকাকা বাড়ি থেকে বেরুলেন। রোজকার পোশাক—খাটো ধুতি আর লংক্লথের পাঞ্জাবিটা এখন পরনে। কিন্তু আমার চোখদুটো ওর জামাকাপড়কে যেন দেখতে পাচ্ছে না, মনে হল একটা নগ্ন শরীর আমার দিকে হেঁটে আসছে, আমি মাথা নিচু করলাম। খুব চাপা এবং ভর্ৎসনার গলা শুনলাম, 'কোথায় আড্ডা মারছিলে, অ্যাঁ? বাড়িতে চোর ডাকাত ঢুকলে দেখছি টের পাবে না।'

মণিদিকে বলতে শুনলাম, 'আমি স্নান করতে গিয়েছিলাম, সেই ফাঁকে—।'

হঠাৎ মনে হল আমার কানদুটো নেই। দুই হাতের আকর্ষণে আমার মুখটা এখন শিবুকাকার দিকে। সেই রাক্ষসের মতো মুখ করে শিবুকাকা বললেন, 'এখন থেকে স্কুল পালানো হচ্ছে, অ্যাঁ! যদি শুনি কাউকে কিছু বলেছিস তা হলে কেটে টুকরো টুকরো করে গঙ্গায় ফেলে দেব। মনে থাকবে?'

হ্যাঁ, আমার মনে আছে। এতদিন কেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভুলতে পারব না। শিবুকাকার তো এখন পঞ্চাশের ওপর বয়স, আমাকে বাবা বলে কথা বলেন কিন্তু উনি জানেন না, আমি এখনও মনে রেখে দিয়েছি। সেদিন থেকে আমার সব কিছু পালটে যেতে লাগল। মা কেমন দূরের মানুষ হয়ে গেলেন। বাবা দিনরাত অর্থ উপায়ের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন। আমার দিকে নজর দেবার সময় কারও নেই। সব সময় নিজেকে কেমন অসহায় লাগে। মনে জোর পাই না, বোধহয় শিবুকাকা সেদিন ওটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন।

৪

পতিতপাবন কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ছেলের মুখ তাঁর অচেনা মনে হচ্ছে, বউমা ঘোমটার আড়ালে। শেষতক কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন, 'এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরিণামটা নিশ্চয়ই খেয়াল আছে?'

সমীরকান্তি হেসে বলল, 'আমি সব চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'সিদ্ধান্ত! সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা তোমার কতটুকু? আমি তোমাকে চিনি না! ঠিক আছে, তোমাদের যদি মনে হয় অন্য কোথাও তোমরা ভাল থাকবে চলে যাও। কিন্তু কখনও আমাকে বিরক্ত করতে আসবে না।'

'তা হলে আমরা চলি।' সমীরকান্তি পতিতপাবনকে প্রণাম করলে গোপা নিচু হল। হাত বাড়িয়ে বাধা দিলেন পতিতপাবন, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বউমা। এই যে আজ দেমাক দেখিয়ে খোকাকে নিয়ে চলে যাচ্ছ চিরকাল এরকম মাথা উঁচু করে থাকতে পারবে তো?'

'আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমি পারি।'

'বেশ, তা হলে আমাকে আর প্রণাম করতে হবে না।'

সমীরকান্তি বলল, 'আপনি ওকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন—।'

'কোনও কৈফিয়ৎ আমি চাই না। আচ্ছা, আর সময় নষ্ট করতে পারব না আমি। এবার তোমরা এসো।' হাত নেড়ে ওদের যেতে বললেন পতিতপাবন।

'আমরা কেন যাচ্ছি জানতে চাইলেন না?'

'আমি নাটক করা একদম পছন্দ করি না। তাই করলে তুমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়তে তখনই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারতাম। এবার যাও।'

আর কেউ নেই। মা, আঙুর কিংবা শিবুকাকাকে দেখা যাচ্ছে না আশে পাশে। ওরা যখন দরজায় তখন পতিতপাবনের গলা শোনা গেল, 'কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না তো?'

সমীরকান্তি কোনওরকমে উচ্চারণ করল 'মানে?'

'এ বাড়ির কোনও জিনিস যেন সঙ্গে না যায়।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ও বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া জামা কাপড় ছাড়া আর কিছু নিয়ে যাচ্ছে না। ইচ্ছে হলে সুটকেস খুলে দেখাতে পারি।' সমীরকান্তি যেন আদেশের জন্য অপেক্ষা করল।

পতিতপাবন একমুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, 'ঠিক আছে, যদি কিছু না পাওয়া যায় তা হলে থানায় ডায়েরি করব। যাও।'

বাইরে এখনও রোদ ওঠেনি তেমন। সমীরকান্তি সুটকেসটা হাতে নিয়ে সামনে হাঁটছিল হন হন করে। বড় রাস্তায় এসে একবার পেছন ফিরে তাকাতে গোপার চোখে চোখ পড়ল। গোপাকে এখন একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে, মাথায় ঘোমটা নেই, বিয়ের আগের চকিতে দেখা সেই মেয়েটি যেন আবার ফিরে এসেছে। ছোট্ট ভাঁজ পড়ল ঠোঁটে, 'কী হল?'

সমীরকান্তি বলল, 'সুটকেস খুললে বাবা ওই থালাটা দেখতে পেতেন।'

গোপা বলল, 'তাতে কী হয়েছে। থালাটা এ বাড়ির সম্পত্তি নয়।'

সমীরকান্তি বলল, 'কাল রাতে তো কিছুই খাওনি, একটু মিষ্টি খেয়ে নেবে? আমার পকেটে সে সামর্থ্যটুকু আছে।'

গোপা ঘাড় কাত করে স্বামীকে দেখল। তারপর বলল, 'না, খেতে ইচ্ছে নেই। আগে কোথাও যাওয়া যাক—। খাওয়ার জন্য তো সারাজীবনই রইল।'

মগরা স্টেশনে যখন ওরা নামল তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। এখানে যাত্রী নেই তেমন, দু-একজন চাষাভুষো মানুষ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। ওপাশে ধু-ধু মাঠ এপাশে কিছু ঘরবাড়ি। সমীরকান্তি এর আগে কখনও কলকাতার বাইরে যায়নি, ওর ভীষণ ভাল লাগছিল। গোপা খুব ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের সঙ্গে জামশেদপুরে গিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের এই গ্রাম্য স্টেশনটার আলাদা পরিবেশ ওর মনেও ছাপ ফেলেছে। ওরা স্টেশন থেকে ঢালু পথ দিয়ে নীচে নেমে দেখল একটাই সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশে একটা ঝুপড়িমতন চায়ের দোকান। কিছু ন্যাংটা ছেলে ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। বিকাশ এখানেই থাকে, এদের কাছে খোঁজ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। গোপা বলল, 'আমি কোনওদিন ভাঁড়ের চা খাইনি। খাবে?'

ছেলেবেলা থেকেই সমীরকান্তির বাইরে খাওয়ার অভ্যেস নেই, হাতে পয়সাও পায়নি যে ইচ্ছে করবে। কিন্তু মনের মধ্যে চিরকাল একটা দ্বিধার ভাব আছে যে এইসব দোকানগুলো খুব নোংরা হয়।

ভাঁড়ের গায়ে রাজ্যের ধুলো আর গেলাসে অন্য মানুষের রোগ মাখানো থাকে। চা খাওয়ার অভ্যেস তার নেই তবু গোপার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল বেচারার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে অতএব এখন খুঁতখুঁতুনি করার কোনও মানে হয় না। দুটো বিস্কুট আর ভাঁড়ের চা খেয়ে দোকানিকে বিকাশের কথা জিজ্ঞাসা করল সমীরকান্তি।

'বিকাশ—বিকাশ বিশ্বেস? কী করেন বলেন তো?' লোকটা চোখ বন্ধ করল।

'স্কুলে পড়ায়—মাস্টারমশাই।'

'এখানকার স্কুলে তো তিনজন মাস্টার। অঙ্ক মাস্টার বাংলা মাস্টার আর ইংরিজি মাস্টার। ওই নামেই সব ডাকাডাকি হয়। অবশ্যি কয়েক ক্রোশ দূরে লাবণ্য গ্রামে একটা বড় স্কুল আছে—সেখানে থাকতে পারে। তা তেনাকে দেখতে কেমন?' লোকটা একটা হদিশ পেতে চাইল।

সমীরকান্তি নিষ্প্রভ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল, ওর বিশ্বাস ছিল যে বিকাশের নাম বললেই সবাই চিনে যাবে। সে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের অঙ্কের মাস্টারের চেহারা কেমন?'

দোকানি একগাল হেসে বলল, 'ছাত্ররা তাঁরে ফড়িং বলে খ্যাপায়! এই তালপাতার সেপাই। হাঁটেন, না দোলেন বোঝা যায় না।'

গোপা বলল, 'তোমার বন্ধু খুব রোগা বুঝি!'

সমীরকান্তি অবাক হয়ে বলল, 'ধ্যাৎ। বিকাশ ভুঁড়ির জন্য ফেমাস ছিল, ও কী করে তালপাতার সিপাই হবে। না সব গুলিয়ে যাচ্ছে, বিপদে পড়ে গেলাম দেখছি। আরও একটু জানে এরকম মানুষের সন্ধানে সমীরকান্তি চোখ ফেরাল।

গোপা বলল, 'সবচেয়ে ভাল হয় সোজা স্কুলে গেলে। ওকে তো ওখানেই পেয়ে যাবে। এখন নিশ্চয়ই স্কুল বসে গিয়েছে।'

জানা গেল স্কুলটা মাইলখানেক ভেতরে। পয়সা কমে আসছে তবু ওরা রিকশা নিল। আসবার সময় সারাটা পথে সমীরকান্তি গোপাকে বিকাশের গল্প বলেছে। ওই একজনমাত্র যার সঙ্গে সমীরকান্তির মনের মিল হত। একদম সরল এবং সোজা কথা বলার মানুষ। ইচ্ছে করলে আই এ এস দিয়ে বড় চাকরি করতে পারত কিন্তু ইংরেজদের গোলাম হওয়ার চেয়ে দেশ গড়ার কাজে নিজেকে ব্যবহার করাই ও উপযুক্ত বলে মনে করেছে। ওর কাছে একবার গেলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। একটা অজানা অচেনা মানুষের বাড়িতে হট করে গিয়ে উঠতে সংকোচ হচ্ছিল গোপার। কিন্তু জলে নামলে সাঁতার না কেটে উপায় নেই। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার বন্ধু বিবাহিত?'

'কী জানি?' সমীরকান্তি হেসে বলেছিল, 'দেশ গড়ার সঙ্গে বিবাহের নিশ্চয়ই কোনও বিবাদ নেই, কী বলো?'

এখন দুপাশে ধানের ক্ষেত, গাছগাছালি আর পরিষ্কার আকাশের তলা দিয়ে ওদের নিয়ে যখন রিকশা ছুটছিল তখন গোপা বলল, 'ওরকম না হলে বোধহয় কোনওদিন এখানে আসা হত না। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বাধা না থাকলে সিদ্ধি আসে না।' সমীরকান্তি স্ত্রীকে দেখল। এইসব মুহূর্তে নিজেকে খুব অশিক্ষিত মনে হয়, বিবেকানন্দের সব বই পড়ে ফেলবে বলে সে স্থির করল।

গোপা রিকশায় বসেছিল, সমীরকান্তি স্কুলে গিয়েছে বিকাশের দেখা পেতে। দু তিনটে টিনের লম্বা লম্বা ঘর নিয়ে স্কুল। চারধার খোলা, কোন আব্রু নেই। একটু বাদেই ওদের দেখতে পেল গোপা। সমীরকান্তিকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে যদিও ফরসা মুখটা ইতিমধ্যেই রোদ্দুরে লাল। ওর সঙ্গে যিনি আসছেন তাঁকে ওর তুলনায় সামান্য বয়স্ক দেখাচ্ছে। বেশ মোটাসোটা কিন্তু চলনে একটুও শ্লথ নয়।

কাছে এসে সমীরকান্তি পরিচয় করাল, 'এই দ্যাখো, এর নাম বিকাশ। আমি জানতাম ও অঙ্কের মাস্টার, কিন্তু এর মধ্যে যে ও কখন ইংরিজির মাস্টার হয়ে গেছে তা কে জানত! বুঝলি, তোদের অঙ্কের মাস্টারের চেহারার বর্ণনা পেয়ে এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম গোপা এখানে আসার কথা না বললে ফিরে যেতে হত।'

নমস্কার বিনিময়ের পর বিকাশ বলল, 'কী করব বলুন। ছাই ফেলতে ভাঙা-কুলোর মতো সব কাজ করতে হয়। এতবড় একটা জায়গা কিন্তু স্কুল নেই, থাকলেও মাস্টার নেই কিংবা মাইনে নেই। দেশের যা অবস্থা, ইংরেজরা না চলে গেলে এরকমই চলবে। তা এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে গরীবের

ওখানে চলুন, নইলে পাপের বোঝা বেড়ে যাবে।'

গোপা হেসে বলল, 'তা হলে আপনার জমানো কিছু পাপ আছে।'

বিকাশ চমকে উঠে বলল, 'ওরে ব্বাস, আপনি দেখছি দারুণ কথা বলেন। নিজেই ফাঁদে পড়ে গেলাম।' তারপর সমীরকান্তিকে বলল, 'তুই রিকশায় যা আমি সাইকেল নিয়ে আসছি।' রিকশাওয়ালাকে আর বলে দিতে হল না, সে কিছুদূর গিয়ে যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল তার পাশে বিরাট দিঘি। দিঘির চারপাশে ঘন গাছের সারি জলে কালো ছায়া ফেলেছে। যেটাকে বাড়ি বলে মনে হচ্ছিল সেটা একটা মন্দিরের পেছন দিক। টিনের ঘর, নীচটা পাকা। আশেপাশে আর বাড়ি নেই। রিকশার ভাড়া চুকিয়ে সমীরকান্তি দেখল গোপা তরতর করে দিঘির পাড়ে উঠে গেছে। জায়গাটা সামান্য উঁচু। সমীরকান্তি সুটকেস হাতে সেখানে এসে জলো বাতাসের স্পর্শ পেল। আশেপাশের অজস্র গাছগাছালি থেকে পাখির ডাক ভেসে আসছে। এই প্রায় দুপুরে ঘুঘুরা অদ্ভুত দুলনি এনে ডেকে যায়। দিঘিটা বহুদিন সংস্কার করা না হলেও বোঝা যায় এখানে জল খুব গভীর। একটা ভাঙা বাঁধানো ঘাট আছে যার সিঁড়ি শ্যাওলায় মাখামাখি। এই সময় গোপা আলতো করে সমীরকান্তির হাত স্পর্শ করে বলল, 'এই, ওদিকে দ্যাখো।'

সমীরকান্তি দেখল। বেশ লম্বা, গায়ের রং পাকা সোনার মতো, একজন প্রৌঢ়া যার গায়ে লাল টকটকে শাড়ি, মাথা থেকে কোমর ছাড়িয়ে পড়া লম্বা জটা। যেটাকে মন্দির বলে মনে হচ্ছিল তার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে উনি এদিকে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতে হাত নেড়ে ডাকলেন কাছে। সমীরকান্তি নিচু গলায় স্ত্রীকে বলল, 'সন্ন্যাসিনী মনে হচ্ছে, এসো।'

গোপা একটু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, 'বিকাশবাবুর আসা অবধি না হয় অপেক্ষা করো। আমার কেমন লাগছে।'

কিন্তু তার আগেই মহিলা দুপা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই তোরা কে রে?'

আর দূরে থাকা যায় না, ওরা কাছাকাছি হল। গোপা দেখল মহিলার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও শরীরের বাঁধুনি এখনও ঢিলে হয়নি।

সমীরকান্তি বলল, 'আমি বিকাশের বন্ধু, ও এখনই আসছে।'

'ওমা তাই নাকি! তা অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন, আয় ছায়ায় আয়। বিকাশ ছোঁড়ার তো তিনকুলে কেউ নেই জানি, কোথাকার বন্ধু তুই?'

'আমরা একসঙ্গে পড়তাম।'

'তাই বল।' মহিলা মন্দিরের ভেতর কয়েক পা গিয়ে একটা চাবি নিয়ে আবার বেরিয়ে এল, 'চল, বিকাশের ঘরটা খুলে দিই।'

সমীরকান্তি ইতস্তত করল, 'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বিকাশ আসুক।'

'সে জানে তোরা এসেছিস?'

'হ্যাঁ। আমরা ওর স্কুলে গিয়েছিলাম।'

'সঙ্গে এটি কে?'

'আমার স্ত্রী।'

'বিয়ে করা না এমনি এমনি।'

ফোঁস করে উঠল, গোপা, 'মানে?'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় করে হেসে ফেললেন মহিলা, 'ওরে বাব্বা, এ যে সাক্ষাৎ কেউটে সাপ। বুঝেছি! তা বেড়াতে এলি না থাকবি?'

সমীরকান্তি দেখল বিকাশ সাইকেল চালিয়ে আসছে। ওর মোটা শরীরের ভারে সাইকেলটা খুব সুবিধের নেই। একপাশে গাড়িটাকে রেখে সে হেসে বলল, 'দারোগার পাল্লায় পড়েছিস তো! প্রশ্ন করে পেটের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করবে। দাও, চাবিটা দাও।' হাত বাড়াল বিকাশ।

'আমি একটু বেশি কথা বলি তাই তুই অমন করে বলছিস?' মহিলার মুখ ভার হল। বিকাশ হেসে ফেলল, তারপর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনি হচ্ছেন এখানকার ভৈরবী মা। জাগ্রত ব্যাপার আছে, আমার কাছে অবশ্য লীলাখেলা করেন না। বরং দুটো চাল ফুটিয়ে পেট ভরিয়ে দেন। আর এ হচ্ছে

সমীরকান্তি, বিরাট বড়লোকের ছেলে, এখানে কেন এসেছে এখনও জানা হয়নি।'

সমীরকান্তি বলল, 'বড়লোকের ছেলেকে বড়লোক হতে হবে তার কোনও মানে নেই। আমরা এসেছি তোর এখানে কিছুদিন থাকব বলে। অসুবিধে হবে?'

বিকাশ ভ্রূ কঁচকে তাকাল, 'সে কী? কী ব্যাপার?'

ভৈরবী মা ধমকে উঠলেন, 'এবার দারোগাগিরি করছে কে? বেচারাদের হাতে-পায়ে ধুলো—যা ঘর খোল।'

বিকাশের সঙ্গে সমীরকান্তি এগিয়ে যেতে ভৈরবী মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী ভাই?'

গোপা নাম বলতে অদ্ভুত চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর কেমন গাঢ় গলায় বললেন, 'গোপা নামের মেয়েরা বড় দুঃখী হয়। তোকে শক্ত হতে হবে রে, কখনও মাথা নোয়াস না, বুঝলি।'

বিকাশ এখানে একা থাকে। ওরা ভেবেছিল বিকাশের মা নিশ্চয়ই আছেন কিন্তু তিনি যে বছর দেড়েক আগে দেহ রেখেছেন এবং বিকাশ একা, সেটা জানা ছিল না। সমীরকান্তি বুঝতে পারছিল না কী করবে। সে তার সমস্যার কথা বিকাশকে বলেছে। বিকাশ তাদের যতদিন ইচ্ছে থাকতে বলেছে এখানে। কোনও অসুবিধে নেই, এখন গরমকাল, মন্দিরের দাওয়া পড়ে আছে। বিকাশের ঘরে গেরস্থালি বলতে গেলে কিছুই নেই। এখানে জুড়ে বসে কদিন থাকা যায়? গোপার কিন্তু জায়গাটা এর মধ্যে ভাল লেগে গেছে। সবচেয়ে ভাল লাগছে ভৈরবী মাকে। জটাধারী সন্ন্যাসিনী এই মহিলা কী করে যে মনের কথা টের পেয়ে যান যে ওঁর কাছে কিছু লুকোতে ইচ্ছে করে না। এত সরল এবং স্পষ্ট কথা সরাসরি বলতে কাউকে শোনেনি সে। এই গ্রামের মানুষগুলো ওঁকে যে ভীষণ ভালবাসে কদিনে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। রোজ ভোর এবং সন্ধ্যায় যে ভীড় হয় মন্দিরের সামনে সেটার আন্তরিক চেহারাটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অথচ এখনও উনি গোপার সঙ্গে কোনও ধর্মের কথা বলেননি। ছোট কালো পাথরের কালীমূর্তিটাকে দেখেছে গোপা, ভৈরবী মা মেয়ে বলে ডাকেন দেবতাকে। এতদিন বিকাশের খাওয়া ওই ভৈরবী মায়ের সঙ্গেই হত, গোপারা আসার পর সেই নিয়মটা ভাঙছিল। সারাদিন গোপার কিছুই করার নেই রান্না করা ছাড়া। কিন্তু সমীরকান্তির টাকার পুঁজি শেষ, বিকাশের ওপর কতটা চাপ দেওয়া যায়। শুধু ভাতে ভাত খেতেও একটা খরচ আছে। সমীরকান্তি সেই সকালে কলকাতায় বেরিয়ে যায় ফেরে রাত হলে। একটা মানুষের চেহারা যে এতটা ক্লান্ত হতে পারে তা না দেখলে জানত না গোপা। একটা চাকরি, সামান্য মাস্টারি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রথমত ছাত্রদের মাইনেতে স্কুল চলে। তারাই এত গরীব যে তিনজন মাস্টার নিয়মিত ঠিকঠাক বেতন পান না। আর একজন শিক্ষক রাখার বিলাস স্কুল কমিটি করতে পারে না তাই। কিন্তু কলকাতায় নিত্য যাওয়া আসার একটা খরচ আছে—সমীরকান্তি যখন কাহিল হয়ে পড়েছিল তখনই দুটো ব্যাপার ঘটল। একদিন সন্ধের পর বাড়ি ফিরে সমীরকান্তি একগাল হেসে বলল, 'এতদিনে একটা ব্যবস্থা হল।' গোপার মনে হল চেপে বসা পাথরটা যেন হঠাৎ আলগা হয়ে যাচ্ছে। ওর কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না। 'আহেরিটোলায় গিয়েছিলাম, ওখানে একটা বড় প্রেস আছে। সেখানে পটুয়াটোলার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা যিনি প্রেস বিক্রি করবেন বলে জানতাম। আমায় দেখে খুব খুশি। বললেন, বয়স হয়ে গেছে বলে বিক্রি করে দেবেন ভাবছেন কিন্তু ভাল দাম পাচ্ছেন না। আমি বললাম বিক্রি না করে আমাকে পার্টনার নিয়ে চালান না। টাকা পয়সা দিতে পারব না। পার্টনার হব কাজ করে, ওয়ার্কিং পার্টনার। উনি চিন্তা করবেন বললেন, কাল যেতে বলেছেন।'

কোথায় কী আর সেই আনন্দেই সমীরকান্তির মেজাজ ফিরেছে। গোপা স্বামীর দিক থেকে মুখ ফেরাল। এরকম মানুষকে নিয়ে কী করে যে লড়াই করা যায়। একজন চিন্তা করবে বলাতেই উনি ধরে নিলেন কাজ হয়ে গেছে। চমৎকার।

দ্বিতীয় ব্যাপারটা করলেন ভৈরবী মা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চিৎকার চেঁচামেচি। কী ব্যাপার, না উনি স্বপ্ন দেখেছেন যে এই মন্দির চত্বরে আর কারও রান্নাবান্না চলবে না। যদি কারও থাকতেই হয় তবে তাকে ভৈরবী মায়ের হাতেই খেতে হবে। হয়তো রোজ রোজ মাংস মিঠাই খাওয়াতে পারবেন না কিন্তু পাঁচজনের দিয়ে যাওয়া নৈবেদ্যের তো অভাব নেই।

আদেশটা এমন জোরালো যে তার বিরুদ্ধে কোন অ্যাপিল চলে না। বিকাশ গোপাকে বলল, 'বউদি, আর আপত্তি করবেন না, কেউ যদি আমাদের জন্যে খেটে মরতে চায় মারুক। আমরা পায়ের ওপর পা দুলিয়ে সাঁটব।' তারপর গলা নামিয়ে শোনাল, 'ভীষণ রাগি লোক, বাণফান মারে।'

ভৈরবী মা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, চিৎকার করে বিকাশের শ্রাদ্ধ শুরু হল এবার।

সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল গোপার। পাশে সমীরকান্তি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। পটুয়াটোলার সেই ভদ্রলোক রাজি হয়েছেন। সমীরকান্তিকে ঘুরে ঘুরে কাজ জোগাড় করতে হবে, খাটাখাটানি সবই তার। তবে যে বাড়িটায় এখন মেশিন আছে সেটা ছেড়ে দিতে হবে। একটা নতুন বাড়ি চাই। সমীরকান্তি তাই বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে কলকাতা শহরে। লোকটাকে দেখলে ভাবাই যায় না যে তার বাবার গোপান সিন্দুকে এখনও লাখ লাখ টাকা ঠাসাঠাসি রয়েছে। কোনও আফসোস নেই, ভুলেও ওসব কথা উচ্চারণ করে না। ওরা যে এতদিন এই গ্রামে রয়েছে কেউ খোঁজ করতে আসেনি। অবশ্য এই অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা কারও পাওয়ার কথা নয়। গোপা নিজে মাকে কিংবা কালীঘাটে কোনও চিঠিপত্র দেয়নি। দিতে ইচ্ছে করেনি।

ঘুম আসছিল না আর, গোপা উঠে বসল। টিনের ছাদ, এক ইটের দেওয়াল। হাওয়া ঢোকে না, বড্ড গুমোট। খোলা জানলা দিয়ে জোছনা দেখা যাচ্ছে। আজ বোধহয় পূর্ণিমা। বেচারা বিকাশকে এ ঘর থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত করা হয়েছে। ভুলেও গোপা থাকলে এখানে ঢোকে না। এরকম মানুষ পৃথিবীতে এখনও পাওয়া যায়! গোপা স্বামীর দিকে তাকাল। ঈশ্বর এদের একা পাঠান না বলে পৃথিবীটায় কতগুলো জিনিস বেঁচে থাকে।

দরজা খুলে বাইরে এল সে। চমচমে জোছনায় চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। ভরদুপুরে হঠাৎ মরে যাওয়া রোদের গায়ে হলদে সর জড়িয়ে দিলে বোধহয় এরকম দেখাবে। চারধার ফাঁকা, শুধু শনশনে হাওয়ারা গাছাগাছালিতে শব্দ করে যাচ্ছে। এই মায়াময় চরাচর দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে গোপা দিঘির পাড়ে উঠে এল। কালো, মাছের চোখের মতো কালো জলে চাঁদ সাঁতার কাটছে। অদ্ভুত একটা মমতামাখা গন্ধ উঠে আসছে কোথা থেকে। গোপার হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। এই খোলা আকাশ থেকে উপচে পড়া চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে বুকের ভেতরটা এমন করছে কেন?

'খুব সাহস বেড়ে গেছে দেখছি।'

গলাটা শুনে চমকে ফিরে তাকাল গোপা। বুকের ভেতর আচমকা এমন ধপ করে উঠেছিল, হৃৎপিণ্ড এখনও বলের মতো লাফাচ্ছে। দিঘির পাড়ে বাবু হয়ে বসে থাকা ভৈরবী মাকে এতক্ষণ সে লক্ষই করেনি। এই নির্জন সাদা জোছনায় ওঁকে কেমন অপ্রাকৃত লাগছে। কোনওরকমে হেসে বলল, 'আপনি! একদম দেখতেই পাইনি।'

'এইরকম অন্যমনস্ক হয়ে রাত্তিরে বেরুতে হয়। গরমকাল, সাপখোপ আছে।'

'আপনি যে বসে আছেন?'

'আমর কথা আলাদা। সাপ জানে কামড়ালে সেই মরে যাবে। কিন্তু তুই কী। তোর খেয়াল নেই আর একজন দিন দিন বড় হচ্ছে!' ভর্ৎসনটা এমন গলায় এল যে গোপা হতভম্ব হয়ে গেল। এখানে এতদিন হয়ে গেল কখনও একথা বলেননি উনি। এমনকী সমীরকান্তিকে খবরটা দেব দেব করে দেওয়া হয়নি। মানুষটা এমন বেআক্কেলে যে গোপার শরীরের দিকে বোধহয় খোলা চোখে তাকায়নি কোনওদিন। পাশাপাশি রাত কাটিয়ে কোনও পুরুষ মানুষ বুঝতে পারবে না যে সময়টা অনেকদিন চলে গেছে।

'আয়, আমার পাশে এসে বস।' ভৈরবী মা ডাকলেন।

'কী সুন্দর রাত, ভাগ্যিস ঘুম ভেঙে গেল।'

পাশে বসে কথা ঘোরাল গোপা।

'হুঁ' হাসলেন উনি, 'এই দ্যাখ না, আমার এত বয়স হয়ে গেল তবু পূর্ণিমার রাত্তিরে ঘুম আসতে চায় না।'

'কেন?' কৌতূকবোধ করল গোপা।

'বিষ রে বিষ। সারা শরীর জ্বলে যায়।'

'লোকে বলে আপনি নাকি মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছেন।' অ্যাদ্দিনের কৌতূহলটা বলে ফেলে তাকাল গোপা।

ভৈরবী মা হাসলেন, 'অনেকে তো ডাকিনী বলে আমাকে তা জানিস না। যে সন্তান জন্মাবে সেই তো মায়ের আশীর্বাদ পায়।'

বাচ্চা মেয়ের মতো গোপা বায়না ধরল 'তবু বলুন না—।'

'দূর পাগলি। ওসব কিছু নয়। আমাদের খিদে পেলে খাই, ব্যথা পেলে কাঁদি—তোর সঙ্গে আমার তফাত কোথায়? যত বানানো গল্প, এই জটাটা আছে বলে।' এক হাতে নিজের চুল তুলে ধরলেন।

'আপনার আত্মীয়স্বজন নেই?' প্রশ্নটা করে গোপা দেখল একটা সাদা পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দিঘির ওপারে উড়ে গেল।

'এই তো তোরা আছিস।' উনি এ বিষয়ে কথা বলতে চান না এটা বুঝতে অসুবিধে হল না এবার। গোপা চুপচাপ বসে থাকল। খানিক বাদে একটা অদ্ভুত অনুভূতি শুরু হল তার। এই নির্জন চরাচরে সে যেন শুধু ভৈরবী মায়ের সঙ্গে বসে নেই, ওই গাছপালা বাতাস কিংবা জোছনায় আরও অনেকে যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। তাদের কাউকে চোখে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তাদের প্রত্যক্ষ করতে পারছিল সে। ওরা কারা জানা নেই, কিন্তু এই অপার সৌন্দর্য গায়ে মেখে চলাফেরা করছে, গোপার সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী মায়ের স্পর্শ পেল সে, 'কী রে ভয় পাচ্ছিস!তোর এখন এইভাবে আসা অন্যায়! শুনেছি পোয়াতি মেয়েদের রাতবিরেতে খোলা আকাশের তলায় বেরুতে নেই।'

হাতের স্পর্শ যেন ম্যাজিকের মতো কাজ করল। একটু আগের ওই অনুভূতি যেন চট করে মিলিয়ে গেল। সে আচ্ছন্ন গলায় বলল, 'আপনি আশীর্বাদ করুন।'

'আশীর্বাদে কতটুকু কাজ হবে রে। পৃথিবীতে এলে কতগুলো কর্ম সম্পন্ন করতেই হবে। সেগুলোকে ঠেকাতে পারা অসম্ভব। সামনে যে রাস্তা আছে সেটায় হয়তো কাঁটা ছড়ানো, কেউ কেউ ওগুলো সরিয়ে দিতে পারে কিন্তু রাস্তাটা তো তোকে হাঁটতে হবেই। শোন মেয়ে, তুই মন শক্ত কর। পাথরের মতো করে ফেল নিজেকে। তোর পেটে যেটা এসেছে তাকে মানুষ করতে হলে এছাড়া উপায় নেই।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন।' গোপা যেন ঢেউ-এর তালে দুলছে।

'কেউ চায় তোর ক্ষতি হোক। এইসব তন্ত্রমন্ত্র মানুষকে কতটা কী দেয় জানি না তবে অনেক কিছু কেড়ে নেয়। যার সঙ্গে একদিন বেরিয়ে এসেছিলাম ঘর ছেড়ে সে তো ওই ক্ষমতা দেখাবার মোহেই চলে গেল। তন্ত্র বড় খারাপ জিনিস। ওকে ব্যবহার করা কি যার তার পক্ষে সম্ভব! তা তোর একজন চেনাশোনা মানুষ এইরকম কিছু করতে চাইছে। একজন সধবা মানুষ, আর একজন, সে কে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোর যদি ডান হাত খসে যায় তা হলেও বাঁ হাতের মুঠো কখনও আলগা করবি না। মেয়েমানুষের মনের জোরের কাছে পৃথিবীর সব অসৎ শক্তি হেরে যাবেই।' কেমন থমথম করছিল ওঁর গলা।

গোপা অন্ধকার দেখল, 'কী ক্ষতি হতে পারে আমার। আমার তো কিছু নেই যে কেউ কেড়ে নেবে।'

'দূর বোকা। ওসব এখন একদম ভাবিস না। সিদ্ধার্থ যাকে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে গিয়েছিল সেই মেয়েছেলের একদম মনের জোর ছিল না। তুই যে অন্যরকম তা প্রমাণ কর।' তারপর কেমন আদরের গলায় বললেন, 'তুই হলি রক্তমুখী নীলা মা, সবার তো সহ্য হবে না।'

সেদিন বিকেলবেলায় সমীরকান্তিকে ফিরে আসতে দেখল গোপা।

সমীরকান্তি একা আসছে না, ওর পেছনে যে আসছে তাকে এত দূর থেকে চিনতে পারল না প্রথমটা। এমনিতেই মুখচোরা মানুষ, গ্রামের লোকেদের সঙ্গে ইচ্ছে করেই আলাপ-সালাপ করেনি। তা হলে কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে গোপা উঠে দাঁড়াল। এই সময় লোকটা যখন হঠাৎ বাড়ি ফিরছে তখন নিশ্চয়ই কোনও ঘটনা ঘটেছে। শরীরের বর্তমান আকৃতিতে বাইরের লোকের সামনে দাঁড়াতে সংকোচ হয়, গোপা ঘরের ভেতরে চলে এল।

ওরা কাছাকাছি হতে চমকে উঠল সে। এ কাকে নিয়ে এসেছে সমীরকান্তি! মানুষটা সরল কিন্তু এতখানি বুদ্ধিভ্রষ্ট হবে কল্পনা করা যায় না। সমস্ত শরীরে নিজের অজান্তে একটা কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল

ওর। কী করবে সে, এখন কী করা যায়?

'এইখানে আমরা থাকি। ওপাশে একটা মন্দির আছে, ওখানে ভোগ পাই।' সমীরকান্তি জানাল। দূর থেকে সে গোপাকে এখানে বসে থাকতে দেখেছিল, এখন কাছে পিঠে না পেয়ে বুঝতে পারল সে অন্যায় করে ফেলেছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমনভাবে হয়ে গেল যে তার কিছু করার ছিল না। পটুয়াটোলার প্রেস থেকে বেরিয়ে মৌলালির একটা অফিসে গিয়েছিল বিল দিতে। ওর প্রথম কাজ। লোকটা বিল পেয়েই টাকা দিয়ে দিল। এত সহজে পাওয়া যাবে আশা করেনি সমীরকান্তি। টাকা পেয়ে মেজাজটা এমন ভাল হয়ে গেল যে অনেকদিন বাদে ট্রামে উঠল প্রেসে ফিরতে। আর সেই ট্রামেই যে শিবুকাকা থাকবে কে জানতো! একটা খালি সিট পেয়ে যেই সে বসতে যাবে তখনই শুনতে পেল, 'খোকা না?'

মুখ ঘুরিয়ে দেখল শিবুকাকা। আর পালাবার পথ নেই। কোনও কথা না বলে ওর হাত ধরে উনি ট্রাম থেকে নামালেন। চারধারে শিয়ালদার ভিড় তার মধ্যেই তিনি চিৎকার করে বললেন, 'তুই একটা মূর্খ নইলে একটা স্ত্রীলোকের মোহে পড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসিস। আরে হতভাগা, তোর বাপের লাখ লাখ টাকা আজ বাদে কাল তোর হবে এ খেয়াল নেই!'

সমীরকান্তির মন এখন ভাল, অনেকগুলো টাকার একটা অংশ ওর হাতে আসবে। তার প্রথম উপার্জন। সে হেসে বলল, 'সবার খেয়াল তো সমান হয় না কাকা।'

'অ।' খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে শিবনাথ চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'কতদিন আয়নায় মুখ দেখিস না? একটা ভিখিরির চেহারা তোর চেয়ে ভদ্র। কার ওপর রাগ জানি না কিন্তু বেরিয়েছিস বাড়ি থেকে তাই বলে ঠিকানাটা রেখে যাবি না?'

'আমাদের ঠিকানা কারও কী প্রয়োজন হবে?' সমীরকান্তি কথা বাড়াতে চাইছিল না।

'অন্তত মুখাগ্নি করার সময় পুত্রের প্রয়োজন হয়।'

'মুখাগ্নি! কী বলছেন আপনি? বাবা কেমন আছেন?'

'ভাল নয়। আজকাল অল্পেতেই মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। আমাকেই যা তা—অথচ আমার হাতে ওর টিকি বাঁধা আছে। আছিস কোথায়?'

'অনেক দূরে। আমি যাই।' সমীরকান্তি পা বাড়াতে চাইল।

'দাঁড়া।' গলার স্বর এমন একটা পরদায় যে সমীরকান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। চল।'

আশ্চর্য! সমীরকান্তি জোর করেও নিজের কাছে হেরে গেল। সে শিবুকাকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলতে পারছে না। শিবনাথ ওকে ট্রামে চাপিয়ে বাগবাজারে নিয়ে এলেন। তারপর একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখানে তুমি কিছুদিন আগে কর্তার সঙ্গে এসেছিলে, মনে আছে?'

সমীরকান্তি বলল, 'হ্যাঁ। এখানে দিদা থাকেন।'

'থাকতেন। মাসখানেক হল সে বুড়ি পটল তুলেছে। আমিই তার ব্যবস্থা করেছি। তা মরার আগে বার বার তোমাকে দেখতে চাইছিল সে। তুমি বাড়িতে নেই শুনে আমাকে বলেছিল, খোকাকে বোলো এখানে এসে থাকতে।'

সমীরকান্তি বুঝতে পারছিল যে তাকে নিয়ে আর একটা ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে। বাবার পালিতা মা মারা গেলেন অথচ দাহ করলেন শিবুকাকা। এই বাড়িতে তাকে আনার পেছনে শিবুকাকার কী পরিকল্পনা আছে সে বুঝতে পারছিল না। শিবনাথ ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে গেছেন। সমীরকান্তি দেখল তিনি সব ভাড়াটেদের চিৎকার করে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করছেন, 'তোমরা বাবা এবার অন্য বাসা দ্যাখো। কর্তার ওখানে জায়গা হচ্ছে না বলে ওঁর ছেলে এখানে এসে থাকবে। বাড়িওয়ালার জায়গা না থাকলে ভাড়াটেকে খালি করে দিতেই হয়। হেঁ, হেঁ, এবার আর কোনও ট্যাঁ-ফোঁ করা চলবে না।'

একজন বিবাহিতা মহিলা বলে উঠলেন, 'তা ওপরে তো অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে। সেখানে থাকলেই পারে।'

'কী কথার ছিরি। এক বাড়িতে ভাড়াটেদের সঙ্গে থাকবে কর্তার ছেলে, বলতেও পারলে মা?' যেন আকাশ থেকে পড়লেন শিবনাথ।

'তা কর্তার মা থাকতে পারল আর ছেলে পারবে না!' কথাটা শেষ করেই মহিলা সমীরকান্তির দিকে

তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি কি আমাদের মানুষ বলে মনে করো না?'

বিব্রত সমীরকান্তি বলল, 'কী আশ্চর্য একথা কেন?'

'তা হলে এই যে বলছে একসঙ্গে থাকলে মানে লাগবে। তা কর্তার মা যখন খেতে পেতেন না আমরাই তো তাঁকে খাইয়েছি, তখন মান কোথায় ছিল। সে বুড়ি বলত তুমি নাকি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, তার কি এই নমুনা?'

সমীরকান্তি বলল, 'শিবুকাকা, আপনি আমার নাম করে এদের যা তা কথা বলবেন না। এ বাড়িতে থাকতে আমি আসিনি।'

শিবনাথ এর জন্যে তৈরি ছিলেন কিন্তু সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলো হকচকিয়ে গেল। একজন বলে উঠল, 'ওমা, বুড়ি বলত তুমি এখানে থাকলে কেউ আমাদের ওঠাতে পারবে না। তুমি কি এখানে থাকবে না বাবা?'

শিবনাথ একগাল হেসে বললেন, 'শুনলে তো, আমি বুড়ির নাম করে মিথ্যে বলিনি।' সমীরকান্তি কোনও কথা না বলে বেরিয়ে এল। শিবনাথ ওর সঙ্গ ছাড়লেন না, 'হন হন করে যাচ্ছ কোথায়, তুমি তো দেখছি ভীষণ বেয়াদপ।'

'আমার কাজ আছে।' সমীরকান্তি এড়াতে চাইল।

'কাজ আমাকে দেখিও না। তোমার ডেরাটা দেখে আসি চলো।' সমীরকান্তি বুঝল এর হাত থেকে আজ কিছুতেই মুক্তি নেই। তবু বলল, 'সেখানে গিয়ে আপনি কী করবেন?'

'কিছু না। রাজভোগ যে খাওয়াতে পারবে না সে তো চেহারা দেখেই বুঝেছি। কর্তাকে গিয়ে বলতে পারব—এই পর্যন্ত।'

প্রেসে আর যাওয়া হল না। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনে উঠে শিবনাথ বললেন, 'ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করো নাকি?'

'হুঁ।'

'সে খবর তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জানে না দেখলাম। তা কী ঠিক করলে, বাগবাজারে কবে থেকে আসছ?'

'আসব কি না ভাবিনি।' কথাটা বলতেই ওর মনে হল পটুয়াটোলার প্রেসের জন্য যে বাড়ি খোঁজা চলছে সেটা এখানেও হতে পারে। বাড়িটার বাইরের দিকে বেশ কিছুটা বাঁধানো জায়গা খালি পড়ে আছে। যদিও সামান্য গলির ভেতরে, তবু বড় রাস্তা থেকে খুব দূরে নয়। গোস্বামীবাবুর নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। একটু ঘিরেটিরে নিলে চমৎকার ব্যবস্থা হতে পারে। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'কত ভাড়া নেবেন?'

চমকে উঠলেন শিবনাথ, 'ভাড়া? নিজের বাড়িতে থাকবে তার আবার ভাড়া কী? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?'

সমীরকান্তি হাসল, 'ভাড়া না নিলে আমি থাকব না।'

'অ।' শিবনাথ ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'এরকম তেজ তো আগে কখনও দেখিনি। খুব টাকার জোর হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'আপনি ভুল করছেন। আমি পার্টনারশিপে একটা বিজনেস করছি। তার জন্য একটা জায়গা দরকার। আপনারা যদি আমাকে ভাড়া দেন তবেই আমি ওখানে যেতে পারি।'

'কর্তা শুনলে কী বলবেন?'

সমীরকান্তি শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'টাকা পেলে বাবা খুশি হবেন।'

শিবনাথ নিজের মনে বললেন, 'ও বাড়িটা ভেঙে একটা বড় ফ্ল্যাটবাড়ি করার ইচ্ছে ছিল কর্তার। ভাড়াটেরা না উঠলে—, এদিকে শরীরও সুবিধের নয়। বেশ, আমি কর্তাকে বলব। কত ভাড়া দিতে পারবে?'

'আমার পার্টনারের সঙ্গে কথা বলে দেখি, উনি কী বলেন।'

'গোস্বামীবাবু পা বাড়িয়ে বসে আছে।'

চমকে উঠল সমীরকান্তি। গোস্বামীবাবুকে এরা চিনল কী করে! ওর মনে পড়ল শিবনাথ তন্ত্রসাধনা

করেন। তান্ত্রিকরা কি সব জানতে পারে? নাকি গোস্বামীবাবু কোনওদিন সমীরের সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে পতিতপাবনের কাছে গোপনে গিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সমীরকান্তি। সে যে অবাক হয়েছে এটা কিছুতেই বুঝতে দেবে না শিবনাথকে। যেন কথাটা তার কাছে মূল্যহীন এমন মুখ করে বসে থাকল সে।

'বউমা কোথায়, ডাকো।' শিবনাথ চারধার দেখতে দেখতে কথা বললেন।

ওঁকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে সমীরকান্তি ভেতরে ঢুকে গোপার মুখোমুখি হল, 'জোর করে সঙ্গে এসেছেন। কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। ডাকছেন, একবার বাইরে এসো।' গোপা দ্রুত ঘাড় নাড়ল, না।

'কী আশ্চর্য, তোমাকে তো খেয়ে ফেলবে না।'

'এ অবস্থায় আমি যেতে পারব না।' স্ত্রীর দিকে তাকাল সমীরকান্তি। সত্যি, যে কোনও মেয়ে এই সময় সংকোচে থাকে। এখন আর কোনও আড়াল নেই। সে মাথা নেড়ে বাইরে বেরিয়ে বলল, 'ওর শরীর খারাপ, মানে, এই সময় আপনার সামনে আসা সম্ভব নয়।'

ভেতরে দাঁড়িয়ে গোপার ইচ্ছে হল নিজের গালে চড় মারে। লোকটার যদি সামান্য বুদ্ধি কখনও হয়, স্ত্রীর বাচ্চা হবার কথা গুরুজনকে বলতে একটুও আটকাল না!

শিবনাথ কথাটা শুনে প্রথমে কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তারপর বললেন, 'ভাল, ভাল। সুখবর! তা এই কুঁড়েঘরে রায়বাড়ির সন্তান জন্মাবে?'

সমীরকান্তি বলল, 'যে যেমন ভাগ্য করে আসবে তেমন হবে।'

'খাওয়াদাওয়া করো কোথায়?'

'তখন বললাম যে, পাশের মন্দির থেকে ভোগ পাই।'

'বিনি পয়সায় খাওয়ায়? কীসের মন্দির?'

'কালীর।'

'তাই নাকি! চলো দেখি।' শিবনাথ নিজেই এগোলেন উৎসাহের সঙ্গে।

এখন মন্দিরের সামনে কিছু মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে। বেশিরভাগই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। সন্ধ্যারতি দেখে এঁরা ঘরে ফেরেন। শিবনাথ যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ জায়গার সন্ধান তোমায় কে দিল? বেশ নিরিবিলি।'

'আমার বন্ধু বিকাশ ওই ঘরটায় থাকত আমরা এসে পড়ায় বেচারা উদ্বাস্তু হয়েছে।' সমীরকান্তির কথা শুনে শিবনাথ একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন, 'তোমার আবার বন্ধু আছে তা শুনিনি তো কখনও। তা তুমি তো দিনরাত কলকাতায় পড়ে থাকে সে সময় বন্ধুটি কি বউমাকে পাহারা দেন?'

'গোপা এমন মেয়ে যাকে পাহারা দেবার প্রয়োজন পড়ে না। সাক্ষাৎ শক্তি।' কথাটা শুনে চমকে তাকাল সমীরকান্তি, সামনে ভৈরবী মা দাঁড়িয়ে। শিবনাথ চোখ কুঁচকে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, দৃষ্টি সরছে না। কথাটা শুনে রাগে শরীর গরম হয়ে গিয়েছিল, সমীরকান্তি কোনওরকমে সামলে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'ইনি আমাদের একজন আত্মীয়, শিবনাথকাকা, দেখা পেয়ে এখানে এসেছেন। ইনি ভৈরবী মা।'

ওঁরা কেউ কথা বলছেন না অথচ দৃষ্টিও সরছে না। দৃশ্যটি ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। হঠাৎ শিবনাথ গা ঝাড়া দেবার ভঙ্গি করে সমীরকান্তির দিকে ফিরলেন, 'আমাকে এক গেলাস জল খাওয়াতে পারো?'

ভৈরবী মা বললেন, 'শুধু জলে কি তৃষ্ণা মিটবে? তুমি বরং ওকে একটু প্রসাদ এনে দাও, মন্দিরের ভেতরের বাঁদিকের ঝুড়িতে আছে।'

শিবনাথ মাথা নাড়লেন, 'না, দরকার নেই। খোকা, আমি কর্তাকে রাজি করাব, তুমি বাগবাজারের বাড়িতে চলে এসো। তোমাদের কথা কেউ ভাবছে না, রায়বাড়ির সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হবে তখন যত্ন হওয়া দরকার।' কথাটা বলে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শিবনাথ হন হন করে স্টেশনের রাস্তায় হাঁটা শুরু করলেন। হতভম্ব হয়ে গেল সমীরকান্তি। শিবুকাকার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণটা সে

বুঝতে পারছিল না। তেষ্টা পেয়েছে বলে জল চেয়ে চলে যাচ্ছেন, সমীরকান্তির মনে হল এতে অকল্যাণ হবে। সে পেছনে ছুটে গিয়ে ওকে ধরবে বলে এগোতেই ভৈরবী মা বাধা দিলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

সমীরকান্তি বললেন, 'উনি জল চাইলেন—।'

'অথচ জল খেলেন না। কেন খেল না তুমি বুঝতে পারবে না।' তারপর কেমন উদাস গলায় বললেন, 'কপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারবে না, নইলে তোমার সঙ্গে দেখা হতে যাবে কেন ওর। আমার শরীরটা কেমন ঘিনঘিন করছে, যাই চট করে একটু নেয়ে আসি।'

ঘরে ফিরে গিয়ে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকল সমীরকান্তি। কী ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকছে না। ভৈরবী মা এবং শিবুকাকার মধ্যে এমন কী ঘটল যে শিবুকাকাকে অমন চোরের মতো পালিয়ে যেতে হল। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি ওঁদের চোখের দৃষ্টিতে দেখেছে সে। তন্ত্রমন্ত্র বিশ্বাস করে না সে। এতদিন এখানে আছে, ভৈরবী মাকে কখনও এরকম চোখে চাইতে দ্যাখেনি। ওদের কাছে উনি সহজ সরল, মায়ের যে চেহারাটা সে কোনওদিন দ্যাখেনি ভৈরবী মা সেই চেহারা নিয়ে ওদের ভরিয়ে রেখেছেন। তবে আজ কেন এমন হল!

গোপা দেখেছে শিবনাথকে হন হন করে ফিরে যেতে। সমীরকান্তির গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

সমীরকান্তি বলবে না বলবে না করেও সব বলে ফেলল। শুনতে শুনতে গোপা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তুমি কেন লোকটাকে নিয়ে এলে, দেখলেই গা ঘিনঘিন করে।'

সমীরকান্তি বলল, 'এর কোনও মানে হয়? ছোটবেলা থেকে ওঁকে কাকা বলে এসেছি।'

গোপার বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা তিরতির কাঁপুনি শুরু হল। ক দিন থেকে ডান চোখ নাচছিল, অমঙ্গল আসছে। সে জানলা দিয়ে ভৈরবী মাকে দ্রুত ফিরে আসতে দেখল। শরীরে ভেজা কাপড়, দিঘিতে ডুব দিয়ে ফিরে আসছেন। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু এখন ওঁকে একলা পাওয়া যাবে না। আরতি হয়ে গেলে ভক্তরা চলে যাওয়ার পর রান্নার সময় একলা পাওয়া যেতে পারে। প্রথম প্রথম গোপা রান্নার কাজে সাহায্য করত, এখন ওকে কিছুই করতে দেন না ভৈরবী মা। এ সময় নাকি আগুনের তাত গায়ে লাগাতে নেই। কিন্তু আর কিছুর তাপ যে ধেয়ে আসছে, গোপা ছটফট করতে লাগল। আজকাল একা থাকলেই ভৈরবী মা ওকে মন শক্ত করতে বলেন। হাজার জিজ্ঞাসা করলেও কারণটা ওঁর মুখ থেকে বের করতে পারেনি গোপা। এখানকার মানুষ বিশ্বাস করে ভৈরবী মা'র দিব্যদৃষ্টি আছে। সেকথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলেন, 'তোরও মাথা খারাপ হল!'

সমীরকান্তি টালমাটাল করছে। বাগবাজারের বাড়ি যদি পাওয়া যায় তা হলে প্রেসটা ভালভাবে চলবে। ভাড়া দিয়ে থাকলে সম্মান যাওয়ার কথা উঠবে না। বাড়িওয়ালা কে সে নিয়ে চিন্তা করে কী লাভ। তা ছাড়া দিদা মারা যাওয়ার সময় যখন চেয়েছিলেন তারা ওই বাড়িতে থাকুক তখন অসুবিধার কিছু নেই। গোপার মুখের দিকে তাকাল সে। হয়তো গোপা ভাবছে সে আবার ফিরে যেতে চাইছে—এই চিন্তাটাই ওকে বিব্রত করছে। আবার গোপার ওই শারীরিক অবস্থায় এরকম অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকাও সমীচীন নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সব তো শুনলে, এবার তোমার কী ইচ্ছে বলো?'

গোপা বলল, 'আমার ভাল লাগছে না, দেখি ভেবে একটু।'

রাত হলে, মন্দির ফাঁকা হয়ে গেলে গোপা এল। সমীরকান্তি একটু আগে গ্রামের দিকে গিয়েছে বিকাশের খোঁজে। সেখানে নাকি বয়স্কদের অক্ষর চেনানোর প্রচেষ্টা চলছে। বিকাশ কী বলে সেটা জানা দরকার ওর।

'এসে গেছিস, আমিই ভাবছিলাম তোর কাছে যাব,' ভৈরবী মা বললেন, 'আয় বস। শরীর কেমন আছে?'

'শরীর আবার খারাপ হল কবে?' গোপা হাসবার চেষ্টা করল, 'আজ আপনাকে আমি ছাড়ছি না। এড়িয়ে যাবেন না।'

'কী জানতে চাস বল।' যেন হাল ছেড়ে দিলেন ভৈরবী মা।

'লোকটাকে কেমন মনে হল?'

'লোকটা? ওমা, হিঁদু ঘরের বউ শ্বশুরকে লোকটা বলে নাকি? লোকে শুনলে বলবে কী?' তারপর গলা পালটে বললেন, 'নেয়ে এসেও মনে হচ্ছিল শরীর ঠিক নেই। মানুষটা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, ভগবান যে কী বিচিত্র সৃষ্টি করেন। কেন এসেছিল ও?'

গোপা সব কথা খুলে বলল। এমনকী সমীরকান্তি যে দোটানায় পড়েছে তাও।

কিছুক্ষণ কী ভাবলেন ভৈরবী মা, তারপর বললেন, 'ওখানে যাওয়া মানে তো আর ওই লোকটার সঙ্গে ঘর করা নয়! ওর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলেই হল। তোর স্বামী যদি ভাড়া দেয় তা হলে তো মাথা উঁচু করে থাকতে পারবি।'

'আমাকে আপনি তাড়িয়ে দিচ্ছেন?' গোপা মুখ ভার করল।

'তাড়িয়ে দেব কীরে, নিজের সাম্রাজ্যে রানি হতে যাচ্ছিস এ তো আনন্দের কথা!'

'তা হলে যাব?'

ভৈরবী মা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর কপালে যা আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। যা হবার তা হবেই। এভাবে সংসারে থেকেও সংসার-ছাড়া কি মানায়। বরং জলে নামলেই সাঁতার শেখা যায়।'

মাথা নামাল গোপা, 'বেশ।'

'তোর স্বামীকে সামলে রাখিস, ও বড্ড সরল। খবরদার ওকে কখনও আগুনের কাছে যেতে দিস না। আগুন ওর শত্রু, মনে রাখিস।' ভৈরবী মা বললেন।

'আগুন!' চমকে উঠল গোপা।

'যা এবার। আমাকে রান্না করতে হবে এখন।'

গোপা জানে আর ভৈরবী মায়ের মুখ থেকে কথা বের করা যাবে না। সে ভারী পায়ে কয়েক পা এগোল। এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে হবে ভাবতেই কেমন অসহায় লাগছে। অথচ প্রথম দিন যখন এখানে এসেছিল তখন মনে হয়েছিল এইরকম মুক্ত এলাকায় কী করে থাকা সম্ভব! বুকের মধ্যে তিরতিরে যন্ত্রণাটা এখন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

পেছন থেকে ভৈরবী মা'র ডাক শুনতে পেল গোপা, 'এই মেয়ে শোন। তোর কাছে একটা জিনিস চাইব, দিবি?'

'আমার কাছে?' প্রচণ্ড অভিমানে গোপা বলল, 'যার কিছুই নেই সে কী দিতে পারে।'

'মারব মুখে এক থাবড়া। ওরকম শিবের মতো স্বামী যার তার কিছু নেই বলতে লজ্জা করল না। মুখে কিছু আটকায় না, না?' ভৈরবী মায়ের উগ্র মূর্তিটার দিকে আর তাকাতে পারল না গোপা, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'তুই আমার কোনও কথা শুনবি না পণ করেছিস না? তোকে বলেছি একদম ভেঙে পড়বি না, শক্ত হয়ে থাকবি, বলিনি?'

দাঁতে ঠোঁট চাপল গোপা, নিজেকে সামলে নিচ্ছিল।

'যা বলছিলাম,' গলার স্বর বদলালেন ভৈরবী মা, 'আমি জানি তোর ছেলে হবে। এই বুড়িটার কথা মনে রেখে ওর নাম রাখিস সায়ক। বল আমার কথা রাখবি!'

হতভম্ব গোপা পাথর হয়ে মুখটার দিকে তাকাল।

ভৈরবী মা বললেন, 'সায়ক কথাটার মানে জানিস? খড়্গ রে খড়্গ। তোর হাতিয়ার। চোখের জল তোর জন্য নয়, তোর দরকার সায়ক।'

৫

কাজের মধ্যে ডুবে গেলে মানুষ যে এত অসামাজিক হয়ে যায় আমি জানতাম না। আমার স্বামীর কথা বলছি। বিয়ের পর মনে হত একটা ইঞ্জিন গোড়া থেকে এমন বিকল হয়ে আছে, সেটার নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। বাগবাজারের এই বাড়িতে এসে সে মানুষটাকে যেন আর চোখেই দেখতে পাই না। এখন দিনরাত খটাং খটাং শব্দ, কম্পোজিটারদের কথাবার্তা, মেশিনম্যানের চিৎকার ছাড়া অন্য কোনও শব্দ

পাই না। সেই সকালে যে নীচে নেমে গেল খেতে আসতে দুপুর গড়িয়ে যায়। খেয়েই আবার ছোটা, ফেরে যখন তখন রাত নিঝুম, বসে বসে ঘুমকে এড়াতে পারি না আমি। বাবুই ওকে বোধহয় ভাল করে চেনেই না। বাবুই ডাক নাম, ভাল নাম সায়ক। সবাই বলে ও নাকি আমার মতো দেখতে হয়েছে, মাতৃমুখী সন্তান নাকি ভাগ্যবান হয়। কী জানি।

বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের কাছে আমার খুব কষ্টে দিন কেটেছিল। সে এক রকম। কিন্তু অভাব কী জিনিস, তার হাড় জিরজিরে চেহারাটাকে জানলাম মগরায় গিয়ে। জেনে জেনে আমি এখন সব সহ্য করতে পারি। বিউলির ডাল আর আলু সেদ্ধ দিয়ে সবটা ভাত খাওয়া যায়, খেতে দেওয়া যায়—কখনও কল্পনা করিনি। এখন অসুবিধে হয় না। বাগবাজারে আসার পর অবস্থার কোনও হেরফের হয়নি এখনও। একথা ঠিক সমীরকান্তির রোজগার বেড়েছে। দিন-রাতে চৌদ্দ ঘণ্টার বেশি খাটলে পুরুষমানুষ উপার্জন করবেই। কিন্তু ঘরে আসছে তার অত্যন্ত সামান্য অংশ। আমাদের থাকার ঘর দুটো বাবদ আর নীচের প্রেসের জন্য যে ভাড়াটা শিবনাথবাবু নিয়ে যান সেটা সমীরকান্তিকেই মেটাতে হয়। গোস্বামীবাবু নাকি পার্টনারশিপের শর্ত হিসেবে প্রেস ভাড়াটা সমীরকান্তির ওপর চাপিয়েছেন। সায়কের বয়স তিন হতে চলল, এখনও আমার নতুন শাড়ি কেনা হয়নি।

শিবনাথবাবু এখানে প্রায়ই আসেন। কারণে অকারণে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, কিন্তু আমি ওপর থেকে নামি না। সমীরকান্তিকে ওঁর কথা বলতে হেসেছিল, 'শিবুকাকা আসে ভাড়া আদায় করতে। নীচের ভাড়াটেরা তো একদিনে সবাই ভাড়া দেন না। বৃদ্ধ মানুষ, একদিন কী করেছিল তা মনে রেখে বিচার করা ঠিক নয়।'

আমরা এখানে আসার পর নীচে যে ক ঘর ভাড়াটে ছিল তারা কেন জানি না এক এক করে সরছে। বোধহয় ওদের মনে হয়েছে আমরাই সব বাড়িটা গ্রাস করে নেব কিংবা ওরা এখানে নিরাপদ বোধ করছিল না। এখন দু ঘর ভাড়াটে অবশিষ্ট আছে। ওদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখেছি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব কথা ফুরিয়ে যায়। মুখে ভদ্রতা রেখেছি কিন্তু আমার সময় কাটে না।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছিল আমার। স্বামী আর ছেলে মরার মতো ঘুমুচ্ছে। ওদের না ডেকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম শিবনাথবাবু আসছেন। সেই খাটো ধুতি, ঢোলা ফতুয়া, এই সকালেও বগলে ছাতি। কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। এই সাতসকালে ওকে এখানে দেখে আমি এমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে উনি যে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে নীচে ডাকছেন প্রথমে বুঝতে পারিনি। আমাকে কেন? দু-একজন মানুষ যারা এই ভোরে পথে বেরিয়েছে তারা ব্যাপারটা দেখছে। আমি দ্রুত ঘরে এলাম। সমীরকান্তি এখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওকে ডাকতে গিয়ে ভাবলাম আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন! উনি একটা মানুষ ছাড়া তো কিছু নন।

নীচে নেমে দরজা খুলতে উনি একগাল হাসলেন, 'যাক, শেষ পর্যন্ত তোমার দরজা খুলল। তা খোকা কোথায়?'

বললাম, 'ঘুমুচ্ছে।'

'খুব খাটাখাটনি করছে তো, ঘুমটা দরকার। তোমাদের তো নীচে একটু বসবার জায়গা নেই। প্রেস তো সব জায়গা দখল করে নিয়েছে। ও দুটো ভাড়াটে যতদিন বিদায় না হবে ততদিন হাত পা মেলার জায়গা পাবে না।' কয়েক পা এগিয়ে প্যাসেজের একপাশে উঁচু বাঁধানো জায়গাটায় ছাতি রেখে বসলেন উনি, 'এখানেই বসি। তুমিও বসো না, দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা বলবে! না, না, শ্বশুর বলে লজ্জা করার কিছু নেই, আমি ওসব মনে করি না।'

কথাগুলো হয়তো আন্তরিক, কিন্তু আমি শক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন এসেছেন?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে।' হাসলেন শিবনাথ, 'খোকার সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ নেই। এই দ্যাখো, আজ মাসের পনেরো তারিখ হয়ে গেল, এখন অবধি সে বাড়ি ভাড়া দিতে পারল না। কর্তা রোজ জিজ্ঞাসা করেন—কতদিন আর চেপে রাখি।'

কথাটা জানতাম না। সমীরকান্তি হয় বলেনি নয় ভুলে গেছে। কিন্তু এই লোকটার মুখে জানার পর সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। বললাম, 'আপনি দাঁড়ান, আমি দেখছি।'

'আরে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কী আশ্চর্য!' আমাকে থামালেন শিবনাথ, 'তোমার শাশুড়ির তোমার

ওপর খুব হিংসে। মেয়েছেলের মন তো, হিংসে ঢুকলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। নিজের ছেলের ক্ষতি করে যদি তোমায় জব্দ করা যায় তাই সে করবে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে সেটি সম্ভব হবে না তা সে জানে। সত্যি বলতে কী তোমাকে প্রথম দিন দেখে এত ভাল লেগেছিল, আহা যেন রাজরাজেন্দ্রাণী। বাড়ি গিয়ে কর্তাকে বলেছিলাম, খোকার পছন্দ আছে। আপনি অমত করবেন না, এখানেই বিয়ে দিন। আমি না থাকলে বাপু তুমি এ বাড়িতে আসতে পারতে না।' হেঁ হেঁ করে হাসলেন শিবনাথ। বুঝতে পারছিলাম না লোকটার উদ্দেশ্য কী। মনে মনে চিন্তা করছিলাম সংসার খরচের নামে যে টাকাটা সমীরকান্তি দেয় তা থেকে ভাড়ার টাকা পুরো মিটিয়ে দেওয়া যায় কি না।

'তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?' শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

'এসব কথা শুনে কী লাভ!'

'আমার কষ্ট হয়, বুঝলে, বড় খারাপ লাগে। বিয়ের আগে তোমার চেহারা দেখলে বুক জুড়িয়ে যেত। সেই চেহারার কী হাল হয়েছে, চোখ চাওয়া যায় না। এভাবে ছোটলোকের মতো বেঁচে থাকা তোমার শোভা পায় না। ছেলেটার কথা চিন্তা করতে হবে তোমাকে।' মমতামাখা গলায় কথাগুলো বললেন শিবনাথ।

হতভম্ব হয়ে আমি বললাম, 'আমাকে কী করতে হবে?'

যেন একটু আশার আলো দেখলেন শিবনাথ, 'তুমি আমার কথায় রাজি হয়ে যাও। আমি তোমার কোনও অভাব রাখব না। রানির মতো থাকবে তুমি। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি আমার মুঠোর মধ্যে। একটু ট্যাঁ-ফোঁ করার ক্ষমতা নেই ওদের। তোমার শ্বশুরের যত কালো টাকা তার সব হিসেব রাখি আমি। আমি বিগড়ে গেলেই উনি জেলে যাবেন। দরকার হলে সেসব টাকা তোমার কোলে এনে দেব। খোকা তো একটা গবেট, সে কিছু টের পাবে না। সেই প্রথমদিন দেখার পর থেকে আমি রাত্রে ঘুমুতে পারি না ভাল করে। বয়স হয়েছে তাই বলে অকর্মণ্য ভেবো না।'

দাউ দাউ করে মাথায় যেন অজস্র লকলকে আগুন নাচছে, আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে। নোংরা ইতর বদমাশ। আপনি আমার শ্বশুর হয়ে এসব বলছেন, ছি ছি ছি।'

'আঃ চেঁচাচ্ছ কেন? নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে আঃ।' থামাতে চেষ্টা করলেন শিবনাথ, 'বড্ড গুমোর না? এখনও বিষদাঁত ভাঙেনি? নাতি হল, বংশের একমাত্র সলতে তবু কর্তা কেন আসেনি দেখতে তা খেয়াল আছে? আইনমতো সেই সব পাবে কিন্তু কর্তা যদি স্বীকার না করেন তো সব লবডঙ্কা। ছেলেটা যে খোকার তার কোনও প্রমাণ আছে। এক বন্ধু তো মগরায় দিনরাত পড়ে থাকত। তোমার শাশুড়ি চাল চালছে—হেঁ হেঁ। তাই বলছিলাম মাথা গরম করো না, একদম মাথা গরম করো না। আমার কথা শোনো, তুমি যে একদম ন্যাদারাম নও তাই ভাল লাগে। লঙ্কায় যদি ঝাল না থাকে তো খেয়ে সুখ নেই।' আমি আর দাঁড়ালাম না, হন হন করে ওপরে উঠে এলাম। নীচের ভাড়াটেরা উত্তেজিত কণ্ঠের আকর্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এখনও সমীরকান্তিদের ঘুম ভাঙেনি। সুটকেসটা খুলে সবকটা টাকা বের করে দ্রুত গুনলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত স্বস্তি উত্তেজনাটাকে থিতিয়ে দেয়। সমস্ত শরীর শান্ত, পায়ে জোর এল। এ মাসের ভাড়ার টাকা টায় টায় রয়েছে সুটকেসে। নোটগুলো নিয়ে নীচে নেমে এলাম। ভাড়াটেরা তখনও এলোমেলো দাঁড়িয়ে কিন্তু শিবনাথ নেই। আমি যখন এপাশ ওপাশ খুঁজছি তখন একজন বলে উঠল, 'প্যাদাবাবুকে খুঁজছ বউমা? তিনি চলে গেছেন।'

টাকাটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া হল না বলে আফসোস হচ্ছে, তবু দরজায় এসে গলিতে উঁকি মারলাম। না কোথাও শিবনাথ নেই। হঠাৎ শরীর ভারী হয়ে কান্না এল। নিজেকে খুব খেলো ঠুনকো মনে হচ্ছে এখন। মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার রূপ। অন্যমনস্ক হয়ে ফিরে আসছিলাম হঠাৎ এক ভাড়াটে-বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও বউমা, ওটা কী পড়ে আছে দ্যাখো।' হই হই করে ছুটে এল আরও দু-একজন।

দেখলাম একটা টাটকা জবাফুল প্যাসেজের মধ্যিখানে পড়ে আছে। এই সাতসকালে এমন সুন্দর ফুল কে ফেলল এখানে বুঝতে না পেরে কৌতূহলের চোখে বুড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। বুড়ি তখন বিড়বিড় করে বলছে, 'হে মা কালী হে মা দুর্গা, তোর বরে আমি বিষহরি হই মা—যে বাণ মারে তার

অঙ্গে কুষ্ঠ হোক মা।' অবাক হয়ে দেখলাম বুড়ি অনর্গল কী সব মন্ত্র পড়ে তিনবার মা মা বলে মাটি থেকে ফুলটা তুলল। ফুলটার কাছাকাছি হতে দেখলাম টকটকে লাল পাপড়িগুলোর গায়ে রেণুর মতো সিঁদুর মাখানো—চট করে বোঝা যায় না।

সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের মুখটা মনে পড়ে গেল আমার। একটা মানুষ কতখানি শয়তান হতে পারে! উঃ। একে কি বাণ মারা বলে। কাকে মারছে বাণ! মনে হল সায়কের জন্মটা ওদের লোভের গায়ে আঘাত হেনেছে। এক নিশ্বাসে ওপরে দৌড়ে এলাম। সায়ক ঘুমুচ্ছে এখনও, সম্পূর্ণ সুস্থ। ওকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের কাঁপুনি থামাতে চাইলাম। একটা নরম শরীর, ঘুমে কাদা কিন্তু কতখানি শান্তি এনে দিল আমার মধ্যে তা বোঝাতে পারব না। খানিক বাদে শুনলাম স্বামীর গলা, 'কী হল তোমার?'

আমি উঠলাম না। কোনও কথা না বলে পড়ে থাকলাম। বুঝতে পারছি আমার হাতের বাঁধনে ছেলেটার অস্বস্তি হচ্ছে, উশখুশ করছে ও। সমীরকান্তি বোধহয় কাছে এগিয়ে এসেছে, 'কথা বলছ না যে, কাঁদছ কেন?'

আমি মুখ তুললাম, 'কোথায় কাঁদছি?'

'চোখে জল অথচ কাঁদছ না? সাতসকালে কী হল?'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এ মাসের বাড়ি ভাড়া দাওনি?'

কথাটা শুনেই ওর কপালে ভাঁজ পড়ল। একটু অবাকও হল যেন। তারপর হেসে বলল, 'তুমি এ কথা জানলে কী করে?'

'আগে বলো সত্যি কি না।' আমি চোখ সরাচ্ছিলাম না।

'হ্যাঁ মানে—,' একটু দ্বিধায় পড়ে ও বলল, 'আজকালের মধ্যে দিয়ে দেব। আসলে একটা বিল আটকে আছে বলে—শিবুকাকা এসেছিল?'

টাকাগুলো জামার ভেতর থেকে বের করে ওর সামনে রাখলাম, 'আজই দিয়ে দেবে, আমি কোনও কথা শুনতে চাই না।'

'তুমি কোথায় পেলে টাকা?' চমকে উঠল সে।

'সংসার খরচের।'

'সেকী! তা হলে কাল খাবে কি?'

'খাব না।'

ও কিছু না বলে নেমে গেল বিছানা থেকে। হঠাৎ আমার একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগল। ভৈরবী মাকে অনেকদিন দেখিনি। আজ মনে হল ওঁকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। অন্তত ওই সিঁদুর মাখা জবাফুলটা থেকে উনি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি ওকে ডাকলাম, 'একটা কথা রাখবে?'

ও ফিরে দাঁড়াল, 'বলো।'

'একবার মগরায় নিয়ে যাবে?'

'কেন? হঠাৎ মগরাতে যাবে কেন?'

'ভৈরবী মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

কিছু মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে ও বলল, 'তোমাকে বলা হয়নি। একদিন বিকাশের সঙ্গে ধর্মতলায় দেখা হয়েছিল। ভৈরবী মা নাকি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। কেউ কেউ বলে হিমালয়ে, কেউ বলে তারাপীঠের দিকে—।'

বিকেলবেলায় সায়ককে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় গাড়িটাকে গলিতে ঢুকতে দেখলাম। বুকের ভেতর আচমকা হাতুড়ি পেটানো শুরু হয়ে গেল। খানিক আগে সমীরকান্তিকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। এই সময় সে তাগাদায় যায়। গোস্বামীবাবু প্রেসে আছেন। কিন্তু আমি একা ওই গাড়ির মালিকের সঙ্গে কী কথা বলব। বাড়িতে আজকাল পুরনো ছেঁড়া কাপড় জোড়াতালি দিয়ে চালাই, একবার ভাবলাম এটা পালটে আসি, কিন্তু পর মুহূর্তে ঠিক করলাম, না, কারও কাছে আমার লজ্জা সংকোচের কারণ নেই। কাউকে কোনও জবাবদিহি আমি দেব না।

বাড়ির সামনে গাড়িটা থামল। ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দিতে পতিতপাবন রায়কে দেখতে পেলাম। শরীরটা যেন আর একটু বুড়িয়ে গেছে, লাঠিতে ভর করে দরজার দিকে তাকালেন। আমি সরে এলাম বারান্দা থেকে, ওঁর আসার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি না। শিবনাথবাবু কি ভাড়া না পাওয়ার জন্য ওঁকে রিপোর্ট করেছেন? উনি কি এখন আমাদের উচ্ছেদ করতে এসেছেন? এক মাসের ভাড়া না পেলে সেটা সম্ভব কি না জানি না। আজ সকালে সমীরকান্তিকে যে টাকা দিয়েছিলাম সেটা এখন ওর কাছে। যদি উনি এখন ভাড়া চান আমি দিতেও পারব না।

মিনিট পনেরো কোনও কথা নেই নীচতলায়, উনি কী করছেন বুঝতে পারছি না। সম্ভবত প্রেসে ঢুকে গোস্বামীবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। দরজাটা ভেজিয়ে আমি বসে আছি। নীচতলায় ভাড়াটে বুড়িটাকে যদি এ সময় পেতাম। হঠাৎ দরজায় খুট খুট শব্দ হল। সায়ককে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে দরজা খুলে দেখি গোস্বামীবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর সঙ্গে আমার কখনও কথাবার্তা হয়নি, যদিও একবার সমীরকান্তি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাকে দেখে উনি হাত জোড় করলেন, 'বউমা, আমার হিসেব চুকলো। বয়স হচ্ছিল অথচ নিষ্কৃতি পাচ্ছিলাম না। আজ রায়মশাই এসে মেশিনপত্র নগদ টাকায় কিনে নিলেন। সমীরকে বলো আমার আশীর্বাদ রইল, এখানে আসা আমার নিষেধ হয়েছে, সে যদি প্রয়োজন মনে করে তা হলে আমার বাড়িতে গিয়ে দেখা করে।'

পায়ের তলার মাটি যেন আচমকা সরে গেল, 'আপনি প্রেস বিক্রি করে দিলেন? ও তো কিছুই জানে না।'

উনি হাসলেন, 'বিক্রি না করলে রায়মশাই আমাকে ছাড়তেন না। তা নদীর জল তো চিরকাল সমুদ্রেই যায়। রায়মশাইকে কে না জানে? তোমাদের পুরোপুরি হয়ে গেল। একবার ভেবেছিলাম সমীরের সঙ্গে কথা বলব, কিন্তু রায়মশাই-এর তর সইছে না। ভাল দামও পেয়ে গেলাম—। আর হ্যাঁ, তোমাকে উনি একবার নীচে ডাকছেন।' নেমে গেলেন গোস্বামীবাবু। ওঁর মুখচোখে খুশির ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু আমি জানি সমীরকান্তি এসে যখন শুনবে তখন ওকে দাঁড় করিয়ে রাখা শক্ত হবে। যার টাকা আছে তার হাত এতটা লম্বা হয় ভাবতে পারিনি। প্রেস চলে গেলে এই বাড়ির ভাড়া কোত্থেকে দেব?

একবার ভাবলাম সায়ককে নীচের বুড়ির জিম্মায় রেখে শ্বশুরমশাই-এর সামনে যাব। কিন্তু নামতে নামতে ঠিক করলাম আজ যে কথাবার্তা হবে তা ওঁর নাতি নিজের কানে শুনুক। জানি এক বর্ণ বুঝতে পারবে না, কিন্তু সাক্ষী থাকুক। নীচের ভাড়াটেরা যে যার ঘরে, সামান্য চেঁচামেচি হচ্ছে না। প্রেসের লোকজন সবই বাইরে দাঁড়িয়ে। মালিক বদল হওয়ায় ওরা কাজ করবে কি না ঠিক বুঝতে পারছি না। শ্বশুরমশাইকে দেখতে পেলাম না। পায়ে পায়ে প্রেসের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। পার্টিশন দিয়ে চাতালটাকে তিনটে ঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর আগে আমি কখনও এখানে ঢুকিনি। সমীরকান্তির মুখে শুনেছি প্রথমটা অফিসরুম, ভেতরে কম্পোজিটার আর মেশিনরুম। অফিসঘরে টেবিলের ওপাশে পতিতপাবন রায় বসে আছেন। তাঁর সামনের চেয়ারে গোস্বামীবাবু। আমি দরজায় দাঁড়াতেই গোস্বামীবাবু বললেন, 'তা হলে আমি চলি।'

পতিতপাবনের শরীর খারাপ দেখালেও গলার স্বর একইরকম আছে, 'হ্যাঁ, আসুন।'

উনি চলে গেলে আমি বললাম, 'আমাকে ডেকেছেন?'

আমার চেহারাটা যেন ভাল করে দেখলেন পতিতপাবন। আমি লক্ষ করলাম ওঁর ঠোঁটের কোণে যেন কৌতুকের ভাঁজ পড়ছে। তারপর ওঁর নজর পড়ল সায়কের দিকে। আমার কোলে চেপে বেচারা প্রথম তার ঠাকুরদাকে দেখছে। তারপর ওঁর গলা শুনলাম, 'কী নাম রেখেছ?'

'সায়ক।' আমার গলা একদম পরিষ্কার।

'সায়ক? মানে কী? আজকাল যত মিনিংলেশ নাম রাখা ফ্যাশন হয়েছে।'

'সায়ক মানে খড়্গ। কুঠার।' বললাম।

'কুঠার? ও কুঠার নিয়ে কী করবে? কাঠ কাটবে?' হে হে করে হাসলেন পতিতপাবন, 'সামনে চেয়ারে বসো।'

এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলাম ও আমার অস্ত্র। যে অস্ত্রের নাম কেন খড়্গ তা যদি জানতেন তা হলে এভাবে হাসতেন না। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না, আমার চিন্তা আমারই থাক।

'খোকার রোজগার কত?' জিজ্ঞাসা করলেন শ্বশুরমশাই।

'আমি জানি না।' সত্যি আমার পরিষ্কার ধারণা নেই।

'তোমার শরীর, জামাকাপড় আর ওই ঝাঁটার কাঠিটাকে দেখে আমি অনুমান করতে পারছি। তোমরা এখানে কতদিন আছ?'

অবাক হলাম। ওঁর বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আমরা বাস করছি আর উনি আমাকে ওই প্রশ্ন করছেন। বললাম, 'প্রায় তিন বছর।'

'তিন বছর? অ্যাদ্দিন আছ জানি না তো।'

'সে কী! আমরা তো নিয়মিত ভাড়া দিয়ে আসছি, শুধু এই মাসটা দেরি হয়ে গেল।' কথাটা আমিই তুললাম।

'ভাড়া? কাকে ভাড়া দাও, আমাকে?' সত্যিকারের বিস্ময় ওঁর গলায়।

'শিবনাথবাবু এসে নিয়ে যান।'

উনি কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, 'এই প্রেসটাকে আমি কিনে নিলাম। তোমার স্বামীকে বোলো সে যদি এটাকে চালাতে চায় তা হলে আমার একটাই শর্ত আছে। প্রতি মাসে তাকে লাভের অর্ধেকটা পোস্ট অফিসে জমা দিতে হবে। ওটা আমার শেয়ার। বুঝলে?'

তার মানে উনি কি গোস্বামীবাবুর মতো আধাআধি শেয়ারে প্রেসটা চালাতে চাইছেন? ছিন্নমূল হওয়ার যে দুশ্চিন্তাটা এতক্ষণ ঝাপটাচ্ছিল সেটা শান্ত হয়ে এল। আমি চুপ করে থাকলাম।

'তুমি কত দূর পড়াশুনা করেছ?'

'স্কুলটা পাশ করেছিলাম।'

'তাই নাকি? জানতাম না তো। তা হলে তুমি হিসেব রাখবে। যদি দেখি তুমি হিসেবে কারচুপি করেছ তা হলে রক্ষে রাখব না, বুঝতে পারলে? তোমাদের এই গোস্বামীবাবুটি সেরকমটি করে শুধু নিজের আখের গুছিয়েছে।' ওঁর কথাগুলো শেষ হলে আমি আপত্তি জানাতে গিয়েও চুপ করে গেলাম। যদি শ্বশুরমশাই এই কাজের ভার শিবনাথবাবুকে দিতেন তা হলে কী অবস্থা হত ভাবতে পারা যায় না।

'প্রতি মাসে আমার লোক এসে টাকাটা নিয়ে পোস্ট অফিসে জমা দেবে। মনে থাকে যেন।'

তারপর দু-তিনটে ফর্ম বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'যেখানে যেখানে টিক দেওয়া আছে সেখানে সই করে দাও।'

ইংরেজিতে ছাপানো ফর্ম। ব্যাপারটা কী পড়তে গিয়ে ভাবলাম কী দরকার। ওঁর সব সম্পত্তি আমরা ছেড়ে এসেছি স্বেচ্ছায় উনি যদি সেটাই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে চান তা হলে আপত্তি করব কেন? সই করে দিলাম চোখ বুজে।

'তুমি একবার দেখলে না ওগুলো কী?' একটু অবাক হলেন শ্বশুরমশাই।

'না।'

'কেন? না দেখে সই করা অত্যন্ত অন্যায়।'

'আমার কিছু যায় আসে না।'

'তোমার ছেলের হয়তো আসবে। শোনো, তোমার ছেলের নামে কুড়ি হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিলাম। আজ থেকে দশ বছর বাদে তুমি সই করলে টাকাটা পাবে। কিন্তু ও টাকা যেন ছেলের পড়াশুনা বাবদ খরচ হয়।' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যেন নিমপাতা খাচ্ছ মনে হচ্ছে? নাতির মুখ দেখছি, লোকে বলবে কী। অবশ্য তোমার শাশুড়ির জানার কথা নয়।'

'এর কোনও দরকার ছিল না।' কোনওরকমে বলতে পারলাম।

'আমাকে উপদেশ দেওয়ার স্পর্ধা আমি সহ্য করি না। আর একটা কথা, এই বাড়ির একতলার ভাড়াটেদের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, সামনের মাসে তারা চলে যাবে। তখন এর চেহারাটা পালটানো দরকার।'

'তা হলে আমরা এখানে থাকতে পারব না!'

'কেন? এখানে তোমার শাশুড়ি নিশ্চয়ই আসবেন না।'

'শিবনাথবাবু আসবেন। ওরা থাকলে আমি নিরাপদ মনে করি। এই বাড়িতে একা থাকলে—।' আমি

আর বলতে পারলাম না।

'হুম।' বলে উনি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। সায়ক উশখুশ করছে। বেচারা এতক্ষণ একভাবে কোনওদিন বসে থাকেনি।

হঠাৎ পতিতপাবন উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি ভেব না আমার টাকা পয়সা খোলামকুচি। রাতারাতি দানসাগর করতে বসে গেছি। শিবনাথের হাবভাব আমার ভাল লাগছে না তাই টাকাটা সরিয়ে রাখলাম। একথা কেউ যেন না জানতে পারে। ওই গর্দভটাকেও বলার দরকার নেই। আর ভাড়াটেরা যাবেই তবে আমি একজন ভাল মেয়েছেলেকে পাঠিয়ে দেব তোমরা তাকে খাবার দিলেই চলবে। সে সঙ্গে থাকলে কোনও ভয় নেই।'

বেরিয়ে যেতে যেতে উনি হঠাৎ ঘুরে সায়কের দিকে তাকালেন। 'হারামজাদার চোখদুটো দেখেছ, রায়বংশ বসানো।'

আমি লক্ষ করলাম, উনি একবারও নাতিকে আদর করলেন না। হন হন করে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর গাড়ির চলে যাওয়ার শব্দ হতেই আমি দেখলাম প্রেসের লোকজন কাচুমাচু হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে।

'আপনাদের হাতে কাজ নেই? কাজ করুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

নিজের অজান্তেই আমি আদেশ করে ফেললাম। জীবনে এই প্রথমবার।

একটু একটু করে সুখের দিন দেখতে আরম্ভ করলাম। প্রেসে কাজ হচ্ছে খুব। এক একটা সময় আসে শুনেছি সব দিক দিয়ে ভাগ্য সাহায্য করে। নইলে যে সব কাজ আমাদের পাওয়ার কথা নয় তাও পাচ্ছি। মনে আছে, পতিতপাবন রায় এসে ওসব কাণ্ড করে গেছেন শুনে সমীরকান্তির কী অস্বস্তি। বাবার সাহায্য নেবে না সে কিছুতেই। আমি তাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়েছিলাম এটাকে সাহায্য বলা উচিত নয়। পতিতপাবন যদি ওর সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে চান তা হলে আপত্তির কোনও কারণ নেই। তা এখন ওর আর এক রকম অস্বস্তি। প্রতি মাসে লাভের টাকা দু ভাগ করে হিসেব ঠিক রাখতে হয় আমাকে। পতিতপাবন লোক পাঠিয়ে নিয়ে যান নিজের অংশ আর হিসেবটা। যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমীরকান্তিরই নিতে হয়। ফলে আর এক ধরনের দায়িত্ব এসে পড়েছে ঘাড়ে। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গোস্বামীবাবুর হাতে যখন চাবি ছিল তখনকার সঙ্গে বর্তমানের ফারাক আকাশ-পাতাল।

পরিবর্তন আমারও কিছু হয়েছে। প্রেসের কাজ ঘরে বসে হয় না। নানান প্রয়োজনে ওকে বাইরে যেতেই হয়। ব্যবসাটা এমন, মালিক চোখের আড়াল হলেই বেশির ভাগ মানুষ ফাঁকি দেবার জন্য ওত পেতে বসে থাকে। সামনে না থাকলে রোজ মুঠো মুঠো টাইপ হাওয়া হয়ে যাবে। নিত্য যদি টাইপ কমতে শুরু হয় তা হলে সেই প্রেসের লালবাতি জ্বলতে বেশি দেরি লাগবে না। অতএব এমন একজন মানুষ দরকার হচ্ছিল যে, সমীরকান্তির অনুপস্থিতিতে প্রেসে বসতে পারে। আমাকে ও ঘরে হিসেবপত্র, বিল চালান এসব এনে দিত, আমি তাই দেখে একটা বড় খাতায় হিসেব পাকা করে রাখতাম। কিন্তু প্রেসে বসার মতো নিজের মানুষ আমাদের ছিল না। যদিও একজন বুড়ো মেশিনম্যান, যিনি সব দেখাশুনা করতেন, আমাদের খুব বিশ্বস্ত ছিলেন, তবু অস্বস্তি হত। শেষ পর্যন্ত আমি সমীরকান্তিকে বললাম যে সারাদিনে তো আমার কিছুই করার নেই তাই আমিই বসব। কথাটা শুনে ওর মুখটা যেন কীরকম হয়ে গেল, 'তুমি প্রেসে বসবে?'

'হ্যাঁ। দেখো আমি ঠিক ভালভাবে চালাব।'

'ধুৎ। মেয়েমানুষ কখনও প্রেসের কাজ করে? লোকে কী বলবে?'

কথাটা শুনে আমার শরীর জ্বলে গেল। বললাম, 'যখন মগরাতে আমরা না খেয়ে ভিখিরির মতো ছিলাম তখন লোকে কী বলত?'

ও হাসল, 'দুটো এক কথা হল। তা ছাড়া তখন লোকেই তো সাহায্য করেছিল। ভৈরবী মা বা বিকাশের সঙ্গে তোমার আগে আলাপ ছিল না।'

'তুমি এত গোঁড়া তা জানতাম না।' আমি অভিমানে কথা বলতে পারছিলাম না।

সমীরকান্তি আমাকে বোঝাতে চাইল, 'আরে, তুমি বুঝতে পারছ না, ওখানে তুমি থাকলে কম্পোজিটররা কাজ করতে পারবে না?'

'কেন?' ঠাট্টার সুরটা বুঝতে চাইছিলাম আমি।

'ওরা কাজ করতে করতে নানারকম মুখ খারাপ করে, আজেবাজে গল্প করে, সেগুলো তুমি শুনতে পারবে?'

'তুমি শোনো?' ব্যাপারটা আমার কাছে অজানা ছিল।

'আমার এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।'

'আমারও যাবে।'

আমি জানি যদি জোর করে কিছু চাই সমীরকান্তি বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারবে না। আমি বুঝতে পারছিলাম ওর মনে যে দ্বিধা এসেছে সেটা আমি রায়বাড়ির বউ বলে। আর তাই আমি আরও জেদি হয়ে উঠেছিলাম।

শ্বশুরমশাই সেই যে চলে গেছেন আর এখানে আসেননি। কিন্তু ওঁর নির্দেশ মতন যেদিন ভাড়াটেরা উঠে গেল বাড়ি খালি করে, সেদিন বিকেলে সুধা এসে হাজির হল। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স বিধবা। ভাড়াটেরা কিন্তু যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি।

সুধার সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হল ও বেশ চটপটে, কাজকর্ম করতে অসুবিধে হবে না। রান্নাবান্না থেকে সায়ককে সামলানোর দায়িত্ব যখন ও নিয়ে নিল তখন আমার হাতে সময় প্রচুর। প্রথম দিনই আমি প্রেসের সব লোকের সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম। সমীরকান্তি বাইরে বেরুবার সময় আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যেত আর আমি লক্ষ করে রাখতাম সেই কাজগুলো হচ্ছে কি না। আমার উপস্থিতি ওদের মধ্যে অস্বস্তি আনছে টের পেয়ে আমি ওদের বাড়ির খবরাখবর নিতে আরম্ভ করলাম। ওদের বাড়িতে কে কে আছে থেকে শুরু করে প্রতি জনের আলাদা সমস্যাগুলো শুনে ফেললাম। বেশির ভাগ মানুষই নিচুতলার, শিক্ষার সুযোগ পায়নি। দেখলাম ওদের অন্দরমহলের কথা আন্তরিক ভাবে শুনতে চেয়ে কখন ওদের প্রিয় পাত্র হয়ে গেছি। সমীরকান্তি ব্যাপারটা লক্ষ করে বলল, 'তুমি সত্যি আলাদা জাতের মেয়ে।'

সুধাকে বলেছিলাম শিবনাথবাবুর কথা। চেহারার বিবরণ দিয়ে ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যেন শিবনাথবাবু আমাদের দোতলায় কখনও না উঠতে পারে। সুধা বলল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দিদিমণি, সে মিনসে ইদিকপানে এলে ঝেটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব।'

বলতে নেই, বেশ নিশ্চিন্তে দিন কাটছিল। কিন্তু ইদানীং সমীরকান্তির আবার খুঁতখুঁতানি শুরু হয়েছে। আমাদের মেশিনটা খুব বড় নয়, ষোল পাতার ফর্মা ছাপা হয় না। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ার অর্ডারগুলো পাওয়া যাচ্ছে না তাই। সমীরকান্তি একটা বড় মেশিন কেনার কথা ভাবছে। কিন্তু তার জন্য যে টাকা লাগবে, তা আমাদের বিক্রি করলেও পাওয়া যাবে না। ধৈর্য ধরা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই। একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করছি, শিবনাথবাবু সেই যে এখান থেকে পালিয়ে গেলেন আর তাঁকে দেখিনি। সায়ক যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হল তখন ভয় পেতাম হয়তো ওকে নিয়ে যেতে আসতে ওঁর দেখা পাব। কিন্তু লোকটা যে এ তল্লাট থেকে উধাও হয়ে যাবে—এতটা ভাবা যায় না।

সেদিন রবিবার। প্রেস বন্ধ। অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব। রবিবারের দুপুরটা ঘুমনো ইদানীং ওর বিলাসিতায় দাঁড়িয়েছে, কিছুতেই উঠতে চায় না। সায়ককে তাগাদা দিতে পাঠিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলাম। গায়ে জল ঢালতে ঢালতে ওদের গলা পাচ্ছি। আমার এই হুজুগ নিয়ে বাপ-ছেলেতে কথা হচ্ছে, হঠাৎ মনে পড়ল বেরুবার আগে চা খাব বলে স্টোভে যে জল চাপিয়েছি সেটা নামিয়ে আসার কথা খেয়াল নেই। এতক্ষণে ফুটে যাওয়ার কথা। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'স্টোভটা নিবিয়ে দাও তো।' গরমকালে দুবার স্নান না করলে শরীর ঘিনঘিন করে। একটু সময় লাগে বলে ওর ঠাট্টাও শুনতে হয়। কিন্তু আজ খুব তাড়াতাড়ি কাপড় পালটে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় সায়কের চিৎকার শুনতে পেলাম।

মুহূর্তে মনে হল আমার শরীরে যেন সাড় নেই। আমি নড়তে পারছি না। চিৎকারটা ছুরির মতো আমাকে যেন ফালা ফালা করে দিল।

পরমুহূর্তেই বাথরুমের দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সায়ক, 'মা-মা—বাবার গায়ে আগুন—মা—।' কথাটা যেন মন্ত্রের মতো কাজ করল। এক ঝটকায় আড়ষ্টতা কাটিয়ে দরজা খুলে বাইরে ছুটে এলাম। পাগলের মতন রান্নাঘরের দরজা অবধি এসে থমকে গেলাম একটু। সমীরকান্তি অসহায় হয়ে সারা

ঘরে দাপাদাপি করছে। ওর জামাকাপড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সমস্ত ঘরে কেরোসিনের গন্ধ, স্টোভটা কাত হয়ে জ্বলছে। কিছু না ভেবে বালতিতে রাখা জল ছুঁড়ে মারলাম ওর দিকে। তাতেও হচ্ছে না দেখে নিজের শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরতে ধরতে শুনতে পেলাম সায়ক বাইরের বারান্দায় গিয়ে চিৎকার করছে, 'আমাদের বাড়িতে আগুন লেগেছে, বাবার গায়ে আগুন লেগেছে।'

পরে ভেবেছি, ওইটুকু ছেলে যাকে আমরা নেহাতই শিশু ভাবতাম প্রয়োজনে ওরা কত বিবেচকের মতো কাজ করতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়িটা ভরে গেল। পাড়ার ছেলেরা ছুটে এসেছে। আমার হাতের বাঁধন থেকে সমীরকান্তিকে ছাড়াল ওরা। সমস্ত শরীর জ্বলছে কিন্তু জ্বলুনিটা একদম টের পাচ্ছি না আমি। একটা ভীষণ চেনা মানুষ কী বীভৎস চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। কে একজন বলল, 'জল ঢাললেন কেন, একটা কিছু দিয়ে জড়িয়ে ধরলে হত—ইস্ ইস্।'

যে মানুষ অল্পেই নার্ভাস হয়ে পড়ে তার একটা অন্য চেহারা দেখলাম। অ্যাম্বুলেন্স যখন বাড়ির দরজায়, ছেলেরা স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে চাইলে ও বলল, 'এমন কিছু হয়নি আমি হেঁটে যেতে পারব। আপনারা গোপাকে দেখুন।'

আমার শরীরে আগুন যা করতে পারেনি এখন বোধহয় তাই হল। আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

ওরা আমাকে কেউ কিছু বলেনি। যখনই জ্ঞান এসেছে তখনই চারপাশ দুধের মতো সাদা দেখেছি। কিন্তু সে সময় আমি জেনে গেছি ঈশ্বর আমাকে কী শাস্তি দিলেন। অন্যায় করলেই জানি শাস্তি পেতে হয়, আমি তো কোনও অন্যায় করিনি, তা হলে? পায়ের মাটি আর মাথার ছাদ এমন করে যাদের সরিয়ে দেওয়া হয় তারা বোধহয় কখনও অন্যায় করে না। সাতদিন পর সায়কের হাত ধরে যখন এই বাড়িতে ফিরলাম তখনও আমি একটুও কাঁদতে পারিনি। এই কদিন বেচারা কোথায় ছিল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসাও করিনি। মনে হচ্ছিল এ ছেলেকে আমি কখনও চিনতাম না। সাত-সাতটা দিন ওর বয়স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ওইটুকুনি ছেলে বাবার মুখাগ্নি করে অশৌচের পোশাক পরে আমার পাশে বসে আছে আর আমি কাঁদব? তা কখনও পারি? সমস্ত বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। এখন আমার মা দাদা এ বাড়িতে রোজ যাতায়াত করছে, কিন্তু সে মানুষটা আর ফিরবে না। আমার হাত ধরে যে ওই দমবন্ধ বাড়ি থেকে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এসেছিল তাকে ধরে রাখতে পারলাম না। নিজেকে যদি কেটে টুকরো টুকরো করতে পারতাম তা হলেও শান্তি হত না। আমি যদি মুখ থেকে কথাগুলো বের না করতাম, যদি ওকে স্টোভটা নিবিয়ে দিতে না বলতাম তা হলে ওকে যেতে হত না। আগুন—আগুন আমার সর্বনাশ করল। জানি না ভৈরবী মা এখন কোথায়? কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে সামনে পেলে আমি খুন করে ফেলতাম। মজা দেখছেন? ঢং করে তখন আমাকে আগুন সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। যদি জানতেনই তা হলে বাঁচার রাস্তাটা বলে দেননি কেন? প্রথম থেকে আমাকে বলা হচ্ছিল মন শক্ত করতে। সমীরকান্তিকে যখনই দেখতেন তখন কেমন অদ্ভুত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তার মানে এসব কথা ওঁর জানা ছিল। আচমকা মনে পড়ল সেই সিঁদুরমাখা জবাফুলের কথা। একটা মানুষ যদি তন্ত্রের মাধ্যমে কারও খারাপ করতে চায় আর একজন যাঁর শক্তি আছে তিনি প্রতিরোধ করতে পারেন না! ইচ্ছে হচ্ছিল সোজা শাশুড়ির কাছে চলে যাই, গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'এবার আপনি খুশি তো? নিজের ছেলেকে গিলে আমাকে জব্দ করছেন ওই লম্পট তান্ত্রিকটাকে দিয়ে—আর কী চান, বলুন?'

আমি কিছু ভাবতে পারছি না। একটা চিন্তা করতে গেলেই আর একটা আসে। মা বোঝাতে চাইছেন সব মানিয়ে নিতে হবে। পৃথিবীতে যাওয়া আসাটা নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছেতে হয়—তাই বলে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? কে বলে আমি ভেঙে পড়েছি? আমার সায়ক, আমার খড়্গ আছে আমি ভেঙে পড়তে যাব কেন?

আমার মায়ের কাছে জানলাম সমীরকান্তির মৃত্যুর পর ও-বাড়ি থেকে কেউ আসেনি। কথাটা এ পাড়াতেও কানাকানি হচ্ছে। হাসপাতালে খবর পেয়ে নাকি শিবনাথবাবু গিয়েছিলেন। শুনেই শরীর জ্বলে উঠল, নিজেই বিষ খাইয়ে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে। শ্মশানের কাজকর্ম নাকি ওঁরই তদারকিতে

হয়েছে। এমনকী আমার মাকে খবর দিয়ে সায়কের কাছে এনে রাখার কাজটা করতেও উনি ভোলেননি। এর মধ্যে দুদিন খোঁজখবর নিতে এসেছেন। মাকে বলে গেছেন, কর্তার শরীর খারাপ বলে তাঁকে খবরটা দেওয়া হয়নি। আশ্চর্য ব্যাপার। ছেলে মারা গেল, একমাত্র ছেলে অথচ বাবা তা জানতে পারল না। যদি সেই সময় আমার জ্ঞান থাকত তা হলে আমি লোকটাকে কিছুতেই এত সব করতে দিতাম না। আমি মনে মনে ঠিক করলাম পতিতপাবনের সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করব।

এতদিন প্রেস বন্ধ ছিল। কর্মচারীরা আসছে আর ফিরে যাচ্ছে। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারছে না। প্রেস বন্ধ থাকা মানে জমানো যে সামান্য টাকা আছে তাতে হাত পড়া। মেশিনম্যান ভদ্রলোককে ডেকে বললাম, 'যা হবার তা হয়েছে, এবার কাজ আরম্ভ করুন।'

'আপনি একা পারবেন?' বৃদ্ধ ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল।

'না পেরে আমার উপায় নেই। কিন্তু আপনার, আপনাদের সাহায্য চাই।' আমার মুখ হাত পায়ে এখনও পোড়া দাগ, জানি বেশিক্ষণ তাকানো যায় না, উনি চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে তাই হবে।'

অশৌচ শেষ হল। অশৌচ মানে তো অশুদ্ধি। তার মানে আমি শুদ্ধ হলাম। চমৎকার ব্যাপার। একটুও খুঁত না রেখে সমীরকান্তির শ্রাদ্ধ করলাম। আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ানোর কথা বলছিলেন মা। এবার আমি একরোখা হলাম। সমীরকান্তির আত্মার শান্তির জন্য মানুষ ডেকে কিছুতেই খাওয়াব না আমি। কোন মানুষ—আমার আত্মীয়স্বজন কারা—এতদিনে সব বোঝা হয়ে গেছে আমার।

শ্রাদ্ধের পরদিন খুব ভোরে সুধা এসে আমার ঘুম ভাঙাল। একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলছেন তোমার বউদিকে নীচে আসতে বলো। আমি ডাকাত কিংবা বাঘ নই। সুধা যে চেহারার বর্ণনা দিল তাতে বুঝতে কিছু অসুবিধে হবার কথা নয় কে এসেছে। ওকে বলে দিলাম আমি দেখা করতে পারব না। মায়েরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, শুনে বললেন, 'বোকামি করিস না খুকি। কী জন্যে এসেছেন না জেনে চলে যেতে বলা খুব অন্যায় হবে। তুই ভুলে যাচ্ছিস তোর ছেলে ও বাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকারী। না সুধা তুমি বলো উনি যেন একটু অপেক্ষা করেন।'

শাঁখা সিঁদুর বাতিল করা ছাড়া বিবাহিত জীবনের থেকে নিজের চেহারাটাকে আলাদা করিনি। রঙিন শাড়ি জামা পরলেই সমীরকান্তির আত্মা অবশ্যই অশান্ত হবে না। আমি নীচে নামলাম। ইচ্ছে করেই আমার হাতের পোড়া দাগগুলো ঢাকিনি মুখের তো প্রশ্নই ওঠে না। শিবনাথবাবুর চুলে একটুও পাক ধরেনি চেহারা তেমনই আছে। এতগুলো বছর যে চলে গেছে লোকটাকে দেখে বোঝা যায় না। বগলে ছাতি নিয়ে উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটু জরুরি কথা ছিল।'

'বলুন।' ইচ্ছে করেই ওঁর দিকে তাকালাম না।

'এখন তুমি কী ঠিক করেছ?'

'মানে?'

'এ তো সরল কথা। খোকা নেই, তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ আছে।'

'সেটা আমাকে ভাবতে দিন।'

'তা কী করে সম্ভব। ও তো রায়বাড়ির ছেলে।'

'না ও আমার ছেলে।'

'তুমি দেখছি তেমনই জেদি আছ। শোনো এতদিন তোমার শাশুড়ির ইচ্ছেতে চেপে রাখলেও শেষ পর্যন্ত কর্তা খোকার কথা জানতে পেরেছেন। মানুষটাকে আমি পাষাণ বলে জানতাম, কিন্তু কাল রাত্রে পাড়ার একজনের কাছে খবর পেয়ে একদম ভেঙে পড়েছেন। ডাক্তার বলছে ওঁর হার্ট নাকি খুব দুর্বল বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। তা আমি বলি কী এবার তুমি ও বাড়িতে চলো।'

ওঁর কথা আমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি আপনাকে একথা বলতে পাঠিয়েছেন?'

'না।' দ্রুত ঘাড় নাড়লেন শিবনাথবাবু, 'আমি নিজেই এসেছি। কর্তা মরলে সব বেহাত হয়ে যাবে একথা বুঝতে পারছ না কেন?'

'বেহাত মানে?'

'তোমার ছেলের ভাগ্যে কিছুই জুটবে না। তোমার শাশুড়ি যে কী চিজ তা জানো না তুমি। এখন থেকে প্রহর গুনছেন বোধহয়। সেই সুন্দর বলে যে চাকরটা ছিল সেই এখন ওর মাদুলি। এদিকে তোমার ননদ তো এক কীর্তি করে বসেছেন। ডবল বয়সের এক লোফারকে তিনি সব দিয়ে বসে আছেন। কর্তা জানেন না, জানলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন। অবিশ্যি এখন শরীরের যে হাল তাতে কী করতে পারবেন কে জানে। তাই তোমাকে বলছি তুমি ও বাড়িতে এসো।' এক-একটা মানুষের মুখ আছে যেখানে আন্তরিকতার চেষ্টা করলেও ফোটে না।

'আপনি এত চিন্তা করছেন কেন?'

এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে বোধহয় তাকালেন শিবনাথবাবু, 'একটা কথা তোমাকে বলি, মানুষ কষ্ট করে যে উপার্জনটা করে তার ওপর মমতা থাকবেই। আমি সারাটা জীবন তোমার শ্বশুরের শাগরেদি করে কাটালাম। যে অর্থ উনি পেয়েছেন তার সবটাই আমার বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া। সেটা ন্যায় কিংবা অন্যায় হোক, তাতে যায় আসে না। টাকাটা আমার কাছে না থাকলেও মায়াটা ওঁরও যেমন আমারও তেমন। সেই টাকা নয়-ছয় হোক আমি চাই না।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনি মিছিমিছি আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন, আমার যা বলার তা আপনাকে অনেক আগেই বলে দিয়েছি।'

শিবনাথবাবুর গলার স্বর পালটে গেল, 'কেন বোকামি করছ? তুমি যদি চাও তোমাকে আমি রাজরানি করে দিতে পারি, সে টাকায় তুমি ছেলেকে বিলেত পাঠাতে পারবে পড়াশুনা করতে। আর যদি এইরকম নিজের পায়ে কুড়ুল মারো তবে— '

'এবার আপনি আসতে পারেন, আমার অনেক কাজ আছে।' ওঁকে থামিয়ে দিলাম।

'বেশ। হ্যাঁ একটা কথা, তোমার প্রেসের কী ব্যবস্থা হল?' যেন এতক্ষণ যে মানুষ কথা বলছিল তার থেকে একদম আলাদা গলায় প্রশ্নটা হল।

'প্রেস চলছে।'

'তা চলুক। কিন্তু মস্তিষ্ক না থাকলে যেমন শরীর অচল মেশিন না থাকলে কি আর প্রেস চালাতে পারবে?'

তাজ্জব হয়ে গেলাম। আঘাতটা যে এদিক দিয়ে আসবে কল্পনাও করিনি। মনে পড়ল এই প্রেসের অর্ধেক মালিকানা পতিতপাবন রায়ের, মেশিনের মালিক তিনি, আজ যদি ওটা এখান থেকে নিয়ে যান আমি অথর্ব হয়ে পড়ে থাকব। সোজাসুজি মুখের দিকে তাকালাম, 'শ্বশুরমশাই আপনাকে ওকথা বলেছেন?'

'ছি ছি ওর কী এসব খেয়াল করার মতো শরীর আছে। তবে কি না আজ বাদে কাল তোমার শাশুড়ি তো—বুঝতেই পারছ। তারপর হল গিয়ে তোমরা এ বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আছ, উচ্ছেদ করতে দু মিনিট সময় লাগবে না। তাই বলি ভেবে দ্যাখো। একা মেয়েছেলে এই পৃথিবীতে কতক্ষণ ঘাড় শক্ত করে থাকতে পারে যদি একজন পুরুষ তাকে সাহায্য না করে।'

আমি উন্মাদের মতো ওকে অপমান করতে যাচ্ছি এমন সময় মায়ের গলা পেলাম, 'আপনি একটু চিন্তা করার সময় দিন শিবনাথবাবু। বুঝতেই পারছেন বেচারার মনের অবস্থা কেমন।' সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথবাবু দু হাত জড়ো করে বললেন, 'নমস্কার নমস্কার। এই তো বিচক্ষণ কথাবার্তা। আসলে কী জানেন, বয়স না হলে বিচক্ষণতা আসে না। আজ তা হলে চলি অ্যাঁ।' দ্রুত পা ফেলে লোকটাকে চলে যেতে দেখলাম।

মা বললেন, 'আমি সব শুনেছি। একটা মানুষ যদি মাথার ওপর থাকে তবে মেয়েমানুষের অনেক রক্ষে। আর ওর তো যথেষ্ট বয়স হয়েছে, ভয়ের তো কিছু নেই বাপু। একটু নরম হলে তো শ্বশুরের কুবেরের ধন হাতে চলে আসবে। তখন না হয় দূর করে তাড়িয়ে দিস। একথা তো সত্যি তোর শাশুড়িকে এক ফোঁটা বিশ্বাস নেই, সে মাগি সব পারে।'

কথা আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি দু চোখ ভরে মাকে দেখছিলাম। আমার মা, ওই শরীরে আমি দশ মাস ছিলাম, আশ্চর্য, এতদিনেও আমি ওঁকে একটুও চিনতে পারিনি। আমার চাহনি দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমন করে তাকাচ্ছিস কেন?'

বললাম, 'এমনি। মা তুমি আমাকে এতদিন একটুও শিখতে দাওনি। আজ আমি কত কী শিখলাম মা।'

প্রেস সামাল দেওয়া যে সোজা কথা নয় কদিনেই হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। এতদিন সমীরকান্তি বাইরের কাজ নিয়ে থাকতেন অর্ডার জোগাড় করা, সময়মতো তা পৌঁছে দেওয়া, বিলের তাগাদায় যাওয়া—এসব আমার কাছে একদম অন্ধকার। ফলে দ্রুত কাজ কমতে লাগল। পুরনো কয়েকটা পার্টি ছাড়া আর সবাই এমুখো হচ্ছে না। আমি ঘরে বসে আছি আর লোকে যেচে এসে আমাকে কাজ দিয়ে যাবে এটা সম্ভব নয়। অল্পবয়সি একজন কম্পোজিটারকে এখানে ওখানে পাঠাই কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে না এতটুকু। বাঁচার একমাত্র উপায় হল আমায় বাইরে কাজের সন্ধানে যাওয়া। কিন্তু কলকাতা শহরের কিছুই আমি চিনি না এমনকী যে সব পার্টির কাজ এখানে হত তাদের নাম.ছাড়া চাক্ষুষ পরিচয় কখনও হয়নি। ইদানীং গোদের ওপর বিষফোড়ার মতন কালীঘাট থেকে দাদা দু-একদিন করে এসে থাকছেন। বুঝতে পারছি মা ডেকে আনিয়েছেন আমার শুভবুদ্ধি জাগাতে। কিন্তু এতগুলো লোকের খাওয়ার জন্য যে খরচ হচ্ছে সেটা চালাবার মতো সামর্থ্য আমার কতটুকু সে খোঁজ কেউ করছে না। আমার বিশ্বাস বাইরে গেলে কাজ পাবই কিন্তু প্রাথমিক যে অনিশ্চয়তা এবং দ্বিধা আছে সেটুকু কাটাতে পারছি না মেশিনের কথা ভেবে। জলে নেমে যদি দেখি পেছনে ডাঙা আর নেই। কাজের অভাবে দু-একজন করে কর্মচারী চলে যাচ্ছে প্রেস থেকে। অভাব মানুষকে অনেক প্রচণ্ড শোক ভুলিয়ে দেয়, সমীরকান্তির কথা মাঝরাত না হলে মনে পড়ে না।

বিকেলবেলায় প্রেসে বসে আছি এমন সময় বাইরে গাড়ির শব্দ হল। তারপরই দরজায় শিবনাথবাবুকে দেখতে পেলাম। এখনও মাস ফুরায়নি ভাড়া নেবার জন্য আসা নয় নিশ্চয়ই। ঠিক করলাম সামান্য বেচাল দেখলে আজ কম্পোজিটারদের দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

শিবনাথবাবু প্রেসের ভেতর ঢুকে চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে বললেন, 'তোমার শ্বশুরমশাই মৃত্যুশয্যায়, দেখতে চাও তো তাড়াতাড়ি চলো।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। এর আগে ওঁর মুখে শুনেছি যে পতিতপাবনের শরীর ভাল নেই। কিন্তু অবস্থা যে এরকম তা ভাবিনি। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সমীরকান্তির মৃত্যুর খবর পেয়ে ওঁরা আসেননি, কিন্তু আমার কী করা উচিত। পরক্ষণেই মনে হল কথাটা মিথ্যে নয়তো, কোনও ফন্দি, আমাকে এ বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার একটা ছল। এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি যান, আমি দেখছি কী করা যায়।'

'কী করা যায় মানে?' শিবনাথ সত্যিই চমকে উঠলেন, 'তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

'আপনাকে ওঁরা পাঠিয়েছেন?'

'মাথা খারাপ! এ সময় কেউ তোমাকে ওঁর পাশে দেখতে চাইবে? তুমি যদি মৃত্যুশয্যায় ওঁর পাশে না থাকো, তা হলে আর কোনও চান্স নেই।'

'কীসের চান্স।'

'সম্পত্তি পাবার।'

হাসলাম, এই বৃদ্ধ বোধহয় পৃথিবীতে অর্থ এবং রমণী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না। বললাম, 'সম্পত্তির জন্য নয়, গেলে আমার শ্বশুরমশাই বলেই যাব।' তারপরই মন ঠিক করে ফেললাম। সোজা ওপরে এসে মাকে ব্যাপারটা বললাম। মায়ের চেহারাটা দেখবার মতো হল, যেন সেই মুহূর্তেই আমাকে নিয়ে ও বাড়িতে তিনি ছুটতে চান। আমি ওঁকে নিরস্ত করলাম। যদি যেতেই হয় আমি একা যাব। নীচে নামতেই শিবনাথবাবু বললেন, 'তুমি মেয়েছেলে সেটা আবার প্রমাণ করলে, যাও তোমার ছেলেকে নিয়ে এসো। তোমার চেয়ে ওর মূল্য ওখানে অনেক বেশি।'

এই প্রথম মনে হল লোকটার মনে অন্য কোনও মতলব নেই। কিন্তু এরকম একটা মানুষ নিঃস্বার্থ হয়ে আমার উপকার করতে কেন আসবে তা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। শিবনাথবাবু ড্রাইভারের সামনে, আমরা পেছনে। সায়ক হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছি মা?'

'তোমার ঠাকুরদাকে দেখতে। ওঁর শরীর খারাপ।'

'আমাকে চিনতে পারবে?'

হঠাৎ শিবনাথবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবে। আজ তুমি রাজা হবে।'

দেখলাম সায়ক ভয় পেয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরল। তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি?' আমি শিবনাথবাবুকে বললাম, 'দোহাই, আমার যা হয়েছে হোক, আপনি এর সর্বনাশ করবেন না।'

গাড়ি থেকে নেমে শিবনাথবাবু ভেতরে ঢুকলেন না। বললেন, 'তোমার শাশুড়ির নির্দেশ আমি ওপরে যেতে পারব না। তবে কর্তা ওঁর নিজের ঘরেই ছিলেন, এতক্ষণ আছেন কি না জানি না।'

দীর্ঘদিন পরে আবার এ বাড়িতে ঢুকলাম। সায়ক ছোট ছোট পায়ে আমার আঁচল ধরে হাঁটছে। সদর খোলাই ছিল। ভেতরের চাতালে পা দিতে গলাটা শুনতে পেলাম। এই ক বছরে সামান্য পালটায়নি, চিৎকার করে বলছেন, 'ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি যাচ্ছি।'

দাঁড়িয়ে পড়লাম। কথাটা কাকে উদ্দেশ্য করে বলা লক্ষ করতে গিয়ে গয়লাটাকে দেখতে পেলাম, বেচারা দুধের বালতি হাতে নিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে তাকাতে শাশুড়ির সঙ্গে চোখাচোখি হল, তেমনই রসগোল্লার মতো মুখ, পানের রসে ঠোঁট লাল। আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন, 'ওমা, এ আবার কে?'

বললাম, 'আমি গোপা।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা কী মনে করে এখানে আসা। খুব তো দেমাক দেখিয়ে ভাতারকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলে, সে দেমাক এখন কোথায় গেল? রাখতে পারলে তোমার সোয়ামিকে?' যেন একরাশ নোংরা জল কেউ আমার গায়ে ছুঁড়ে দিল।

'শুনলুম শ্বশুরমশাই-এর শরীর খারাপ—।' আমি ঝগড়া করব না ঠিক করলাম।

'তাই বলো! ভাগাড়ের খবর শকুনের কাছে ঠিক পৌঁছে গেছে গা। ওসব মতলব টতলব নিয়ে এ বাড়িতে আসা চলবে না।' দেখলাম ওঁর পাশে আঙুর এসে দাঁড়িয়েছে। চট করে চেনা যায় না, স্বাস্থ্য এত ভারী যে চোখে লাগে। এমন মুখ করে আমাদের দেখছে যেন আমরা ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

'আপনি কি চান আমরা চলে যাব?' স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলাম।

আঙুর বলল, ' এসেছ যখন তখন বাবাকে একবার দেখে যাও। নাতির মুখ দেখে যদি স্বর্গবাস হয় তো হোক। কী বল মা?'

'তোর আবার বেশি বেশি।' মেয়ের দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন শাশুড়ি, 'কোনও কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করবে না। বুঝলে? উনি এখন ওপরের ঘরে আছেন, ওই যে ঘরটায় তোমরা লীলা করতে সেখানে।'

আমরা উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ আদেশ হল, 'গয়লার হাত থেকে দুধের বালতি নিয়ে এসো তো। ব্যাটাকে নিয়ে আসতে বললেই ওপাশের কল থেকে জল মিশিয়ে আনবে। কাউকে বিশ্বাস করার জো নেই গা। দেখো আবার যেন কমে না যায়।'

শেষ কথাটা কানের ভেতর সিসে ঢেলে দিল যেন। গয়লা ততক্ষণে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় দেখতে পেয়েছে, আমার হাতে বালতি ধরিয়ে দিয়ে সরে গেল। সায়ককে নিয়ে ওপরে উঠছি ও ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই বুড়িটা অমন করে ঝগড়া করছে কেন মা? কে ও?'

'তোমার ঠাকুরমা। চুপ করো, কোনও কথা বলবে না।'

দরজায় এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আমি বুঝতে পারছিলাম না শিবনাথবাবু কতটা সত্যি কথা বলেছেন। বাড়িতে কেউ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকলে গয়লা জল মেশাচ্ছে কি না কারও চিন্তায় আসতে পারে না। তা হলে?

দরজায় দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের সেই খাটটায় পতিতপাবন শুয়ে আছেন। আগে থেকে না জানলে মানুষটাকে আমি চিনতে পারতাম না। অত বড় দশাসই চেহারা যেন শুকিয়ে পাটকাঠি হয়ে গেছে। বুকটা বার বার ওঠা-নামা করছে। সুন্দরদা পাশে একটা চেয়ারে বসে। আমাকে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল ওর মুখে। সায়ককে নিয়ে ঘরের একপাশে দাঁড়ালাম। বুঝতে পারছি ওঁর খুব অস্বস্তি হচ্ছে। একে কি মৃত্যুযন্ত্রণা বলে? জানি না। মনে হল যদি ওঁর বুকে কেউ হাত বুলিয়ে দিত তা

হলে আরাম পেতেন। এগিয়ে গেলাম। আমি কাছে যেতেই সুন্দরদা উঠে দাঁড়াল। আমি সেই চেয়ারটা টেনে পাশে বসে ওঁর বুকে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগলাম। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, মনে হল শরীরটা কাঁপছে। এতক্ষণ চোখ বন্ধ ছিল হঠাৎ পাতা দুটো কাঁপতে কাঁপতে সামান্য খুলল। জানি না উনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন কি না কিন্তু যে দৃষ্টি আমি দেখলাম তাতে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুটে উঠল। একটা মানুষ যখন জানে তার আর সময় নেই তখন কী অসহায় চোখে সে তাকাতে পারে—এ আমি কখনও দেখিনি। সারাজীবন অত্যাচার করে মানুষকে ঠকিয়ে লোকের চোখের জল ফেলে ওই মুহূর্তে ওঁর মনে কোনও অনুশোচনা এসেছিল কি না বলতে পারব না, কিন্তু আজ এই প্রথম আমার মন মমতায় ভরে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কষ্ট হচ্ছে খুব?'

পেছন থেকে শাশুড়ি বলে উঠলেন, 'আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে, এবার সরে বসো তো।' আমি উঠে দাঁড়াতেই তিনি শ্বশুরমশাই-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'চিনতে পেরেছ কে এসেছে? তোমার ছেলের বউ আর নাতি। হিন্দু ঘরের বেধবা রঙিন শাড়ি পরে তোমাকে দেখতে এসেছেন।'

আমার পাশে দাঁড়িয়ে আঙুর বলল, 'মার যেমন কথা। এই বয়সে রঙিন শাড়ি পরবে না কি থান জড়াবে। তা যাই বলো বউদি, তোমার চেহারা এখন বেশ খোলতাই হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়ালে নিশ্চয়ই ব্যাটাছেলেদের মাথা ঘোরে। আমি দ্যাখনা ভাই কীরকম মোটা হচ্ছি, কী করে ছিলিম হওয়া যায় বলো না?'

এই সময় ঘড়ঘড় শব্দটা উঠল। মনে হল ওঁর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। শুনেছি মৃত্যুকালে চরণামৃত দিতে হয়। মৃত্যুকাল কি না জানি না, কিন্তু জল পেলেই ওঁর তৃষ্ণা মিটত। সে কথা বলতেই শাশুড়ি চোখ পাকালেন, 'জল দিলে গিলতে পারবে? গলা আটকে মারতে চাও?'

আমার সেই অভিশাপটার কথা মনে পড়ল। বাগবাজারের বাড়িতে প্রথম যেদিন শ্বশুর আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন সেই বুড়ি দিদা বুক নিংড়ে ওঁকে এই অভিশাপটাই দিয়েছিলেন। ইচ্ছে হচ্ছিল জোর করে বাধা দিই ওঁকে, ফোঁটা ফোঁটা জল ওই শুকনো জিভে ঢেলে দিই। শাশুড়ি বললেন, 'যা আঙুর, এবেলা খেয়ে নে, পরে সময় পাবি না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে না?'

'আচ্ছা বাড় তা হলে। মাংসটা নষ্ট করতে তো পারি না বাপু। পয়সা দিয়ে কেনা।' বলেই আমার দিকে তাকালেন, 'তোমার ছেলেটাকে গিলিয়ে নিয়ে এসেছ তো!'

আমি হাঁ হয়ে শুনছিলাম এতক্ষণ, এবার তড়িঘড়ি বলে উঠলাম, 'না, না, ও খেয়ে এসেছে, ওর জন্যে চিন্তা করবেন না।'

'ভাল। বুদ্ধিমতী দেখছি। তা তোমারও মাছ মাংসে চলে নাকি?'

হঠাৎ সায়ককে বলতে শুনলাম, 'মা মাছ মাংস খায় না।'

'ও বাবা, এ যে দেখছি কালকেউটে। এই বয়সেই এতো—আঁ। সুনু, তুমি বসে থাকো ওখানে। আমরা খেয়ে আসি। দেখো কেউ যেন ওনাকে বিরক্ত না করে।' কথাটা সুন্দরদার উদ্দেশ্যে বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন, 'অনেকক্ষণ দেখলে এবার গেলেই তো হয়।'

চোখের আড়াল হতেই সায়ক আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মিছে কথা কেন বললে মা? আমি তো খেয়ে আসিনি।'

চোখে জল এসে গেল। ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'বড় হয়ে বুঝতে পারবি।'

মিনিট পাঁচেকও হয়নি, চোখের ওপর মানুষটাকে চলে যেতে দেখলাম। যন্ত্রণা যে কত অসহ্য হয় না দেখলে বুঝতাম না। প্রত্যেক মানুষকে তার সারাজীবনের কৃতকর্মের জন্য এমন করে জরিমানা দিতে হয় কি না জানি না। আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। মাথাটি একপাশে হেলিয়ে দিয়ে সুন্দরদা উঠে দাঁড়াল, 'ও বউমণি এদিকে এসো। কর্তা চলে গেলেন।' ওর মেয়েলি গলার ডাক রান্নাঘর অবধি পৌঁছতে দেরি হল। তারপর অকস্মাৎ শাশুড়ির বুক-ফাটা চিৎকার শুনতে পেলাম, 'ওগো, আমার কী হবে গো। এভাবে আমাকে ভাসিয়ে তুমি চলে গেলে গো। আমার যে আর কেউ নেই গো।'

তিরের মতো ছুটে এল আঙুর। ঘরে ঢুকে পতিতপাবনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল 'বাবা,

বাবাগো। একবার চোখ মেলে চাও, তুমি কথা বলো বাবাগো।'

এ বাড়ির সম্মিলিত কান্না সমস্ত পাড়ায় পৌঁছে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রায়বাড়ি লোকে ভরে গেল। আমার আর কান্না আসছিল না। ঘরের কোণে সায়ককে নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে ওদের কাণ্ড দেখছিলাম। শাশুড়িকে ধরে রাখা শক্ত হচ্ছিল, 'এ তুমি কী বললে গো, যাওয়ার আগে এ কী বললে গো। তোমার নাতি থাকতে আমি মুখাগ্নি না করলে তুমি স্বর্গে যাবে না—এ তুমি কী বললে গো।'

আঙুর কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মা তুমি কেঁদো না, বাবা যখন শেষ মুহূর্তে ও কথাই বলে গেলেন, তখন তোমাকে তা পালন করতেই হবে।'

যে কোনও দর্শকের মনে হবে দুটো অসহায়া মহিলা জীবনের চূড়ান্ত শোক পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। শাশুড়ি এমন ভঙ্গি করছিলেন যে মনে হল যে কোনও মুহূর্তেই উনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। সুন্দরদা একজন ঝি-এর সাহায্যে ওঁকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

হঠাৎ শুনলাম, মৃত বাবার বুকে হাত রেখে আঙুর বলছে, 'বাবা চলে গেলেন, তবু তোমার চোখে জল নেই বউদি? তুমি এতো পাষাণ।'

দেখলাম ঘরে উপস্থিত প্রতিবেশী মহিলারা কথাটা শুনে আমার দিকে অবাক চোখে তাকালেন। এইভাবে অপমানে জবাবে আমার কী বলা উচিত ভাবছি এমন সময় সায়ক বলে উঠল, 'বারে, মা-ই তো প্রথমে কেঁদে উঠল তোমরা তো সে সময় খাচ্ছিলে।'

'ওমা, কী মিথ্যুক, আমরা বলে সেই সকাল থেকে ঠায় বসে আছি আর এ কী বলে গো। ওইটুকুনি ছেলেকে এতো মিথ্যেবাদী করে তুলেছ বউদি। ছি ছি, হ্যাঁরে তোরই তো দাদু, তাঁর মড়ার সামনে বসে মিথ্যে বলতে পারলি, জিভ খসে যাবে রে।'

আমি আমার খড়্গকে সঙ্গে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভৈরবী মা কেন ওর নাম সায়ক রেখেছিলেন আজ বুঝতে পারছি। আঙুর যতই চেঁচাক এ ঘরের কজন ওর কথা বিশ্বাস করছে তাতে আমার সন্দেহ আছে।

দোতলার বারান্দায় এসে আজ কেন জানি না খুব ইচ্ছে করছিল একবার ছাদে যেতে। বুঝতেই পারছি এ বাড়িতে আসা আমার শেষ হয়ে গেল। সমীরকান্তির হাত ধরে বেরিয়ে ছিলাম এ বাড়ি থেকে আজ সায়কের হাত ধরে কিছুক্ষণের জন্য ফিরে এলাম। একদিন সেই জ্যোৎস্নার রাত্রে ওই ছাদে আমি একবারই গিয়েছিলাম। কিন্তু মনে হল ওই জায়গাটুকুই এই বাড়িতে আমার আপন ছিল।

রাত হয়ে গেছে। এই ভিড়ে শিবনাথবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না। ভাবলাম যাওয়ার আগে শেষবার শাশুড়িকে বলে যাই। পাশের ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনি নেই। ওঁর নিজের ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। একটা ঝি-এর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম উনি নীচে গিয়েছেন।

একতলার চাতালটায় পাড়ার কিছু ছেলেছোকরা দাঁড়িয়ে। শিবনাথবাবু ওদের সঙ্গে শ্মশানে যাওয়ার ব্যাপারে কথা বলছিলেন। আমার দিকে পেছন ফিরে থাকার দরুন উনি দেখতে পেলেন না। যে ঘরে শ্বশুরমশাই বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতেন সেখানে কেউ নেই। হঠাৎ আমার কেমন সন্দেহ হল। সন্দেহটা কেন এল আমি জানি না কিন্তু আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। শ্বশুরমশাই-এর শোয়ার ঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সন্দেহটা সত্যি হল। সায়ককে নিঃশব্দে দাঁড়াতে বলে আমি দরজার চাবির গর্তে চোখ রাখলাম। দৃশ্যটা অদ্ভুত, শাশুড়ির হাতে একগাদা চাবির তোড়া, সুন্দরদা ওঁর কোমরে হাত রেখে হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে। বোধহয় কিছু চাবি পরীক্ষা করা হয়ে গেছে, দেওয়ালের সিন্দুকের তালা খোলেনি, বাকিগুলি দিয়ে চেষ্টা চলছে। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ওদের কীর্তি দেখলাম একটার পর একটা চাবি গর্তে ঢুকল কিন্তু তালা খুলল না। শেষ চাবিটি যখন বিফল হল তখন শাশুড়িকে রেগেমেগে সব গোছাগুলো মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখলাম। শ্বশুরমশাই-এর ওই যখের ধনের তালার চাবি কোথায় থাকতে পারে আমি জানি না। কিন্তু শাশুড়ির মুখ দেখে আমার এক ধরনের সুখানুভূতি হল। ব্যাপারটা কী রকম আমি বোঝাতে পারব না। সুন্দরদা শাশুড়িকে শান্ত করছিল, শাশুড়ি শুনছিলেন না তারপর হঠাৎ তাঁকে সুন্দরদার বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখলাম।

আর সহ্য হচ্ছিল না, সায়কের হাত ধরে দ্রুত সরে এলাম। হঠাৎ মনে হল শ্বশুরমশাই মারা যাওয়ার পর এই পর্যন্ত শাশুড়ি অনেক কান্নার অভিনয় করলেও এই মুহূর্তে বোধহয় তিনি সত্যিকারের কান্নাই

কাঁদছেন। কিন্তু চাবিটা কেন খুঁজে পেলেন না শাশুড়ি। একটা মানুষ মরে যাওয়ার পর তো কোনও কিছু গোপনীয় করে রাখতে পারে না। এ বাড়ির কোথাও চাবিটা আছে নিশ্চয়ই। শিবনাথকে শ্বশুরমশাই কিছুতেই হদিশ দিয়ে যাবেন না, যে তিনি লুকিয়ে রাখবেন। স্বামীর মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যেই যে স্ত্রী এরকম লোভের হাত বাড়ায় বোধহয় তার ভাগ্যে এরকম হওয়াই উচিত। নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এখন কত রাত জানি না। পাড়াটা নিঝুম হয়ে আসছে। আমাকে যেতে হবে সেই বাগবাজারে। একা কোনওদিন দিনের বেলাতেই আমি যাইনি। হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল, এই পৃথিবীতে আমি এখন একদম একা হয়ে গেছি, সামনের রাস্তাটায় কী আছে জানি না। পরমুহূর্তেই সায়কের ছোট্ট মুঠিটাকে আঁকড়ে ধরলাম। না, আমি মোটেই একা নই।

৬

সাতদিনের মাথায় চিঠিটা বাগবাজারের বাড়িতে পৌঁছাল। মিসেস বনলতা রায়ের পক্ষে তাঁর অ্যাটর্নি জানাচ্ছেন যে মৃত পতিতপাবন রায়ের স্ত্রী হিসেবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার পর বাগবাজারের এই বাড়িটি তিনি খালি অবস্থায় পেতে চান। অতএব এই চিঠি পাওয়ার এক মাসের মধ্যে যেন বাড়ি খালি করে দেওয়া হয়, অন্যথায় আইনের আশ্রয় নেওয়া হবে।

গোপা চিঠিটা পড়ে কিছুক্ষণ জবুথবু হয়ে বসে রইল। ও ভেবেছিল যদি কোনও আঘাত আসে তা হলে সেটা প্রেসের ওপর আসবে। শাশুড়ি তাকে ভাতে মারতে চাইবেন। কিন্তু মাথা থেকে ছাদ খসিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হবে এ চিন্তা মাথায় আসেনি। এখন কী করা যায়? চেনাশোনা এমন একটা মানুষ নেই যাকে এসব কথা বলা চলে। সেদিন অত রাত্রে চলে আসার জন্য মা তাকে যাচ্ছেতাই করেছেন। ওর নাকি খুব অন্যায় হয়েছে, যদি সে মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে যেত এবং অশৌচের সময়টা জোর করে ওখানেই থাকতো তা হলে ওরা নাকি সায়কের দাবি অস্বীকার করতে পারত না। হঠাৎ মায়ের মনে পড়ল এখানে তিনি অনেকদিন আছেন, এবার কিছুদিন কালীঘাটের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবেন।

টুকটাক প্রেসের কাজ হচ্ছে, কোনওরকম চলে যাওয়ার মতো। গোপা প্রেসে বসেছিল। ইদানীং বাংলা প্রুফ সে দেখতে পারে। প্রথম প্রথম সময় লাগত, এখন অনেকটা স্বচ্ছন্দ। হঠাৎ পায়ের শব্দে চোখ তুলে যাকে দেখল তাকে আশাই করতে পারেনি। উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, 'আরে কী সৌভাগ্য, আসুন আসুন, আমি ভাবতেই পারছি না, পথ ভুলে নাকি?'

'পথ ভুলে নয়, প্রয়োজনে। আমাদের অল্প পয়সায় স্যুভেনির ছাপা দরকার। স্কুলে একটা উৎসব হচ্ছে। কলকাতার প্রেসের যা রেট ভাবলাম এখানে এলে যদি কিছু সুবিধে দেন।' কথাটা শেষ করেই বিকাশ পেছনের দেওয়ালটায় চোখ রাখল। সেখানে সমীরকান্তি রায়ের আবক্ষ ছবি বাঁধানো, ফুলের মালায় জড়ানো। চোখ নামিয়ে সে বলল, 'খবরটা আমি অনেক পরে শুনেছি। আসব ভাবছিলাম, কিন্তু একটা ছুতো না পেলে আসতে পারছিলাম না।'

গোপা বলল, 'আপনি তো এরকম ছিলেন না?'

বিকাশ হাসতে চেষ্টা করল, 'বয়স হচ্ছে তো। সময়ের সঙ্গে ধ্যানধারণাও পালটে যায়।'

গোপার ভাল লাগছিল। অনেকদিন পরে সমীরকান্তির বন্ধুকে দেখতে পেল। এই মানুষটি সেদিন যদি ওদের আশ্রয় না দিত তা হলে কী হত চিন্তা করা যায় না। গোপা বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার শ্বশুরমশাই মারা গিয়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ আমার শাশুড়ি আমাকে এখান থেকে উঠে যেতে বলেছেন।'

'সে কী? কেন?'

'উনি বাড়িটা খালি পেতে চান। হয়তো বিক্রি করে দেবেন।' গোপা হাসবার চেষ্টা করল।

'এটা মগের মুলুক নাকি। এ বাড়ির ওপর আপনার সমান অধিকার আছে, আপনার ছেলেই তো ওদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। ওহো, সে শ্রীমানকে দেখাই হয়নি আমার। সে কোথায়? ডাকুন তাকে।'

বিকাশ ব্যস্ত হল।

'সায়ক ওপরে, পড়ছে। এসেছেন যখন তখন দেখা হবেই। কিন্তু আমি কী করি বলুন তো। কোনও রাস্তা পাচ্ছি না।'

'কিছু করবেন না, যেমন আছেন, তেমন থাকবেন।' বিকাশ পরিষ্কার বলল।

'কিন্তু উনি তো কোর্টে যাবেন।'

'তা হলে আপনিও সেখানে যাবেন।'

'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যে লড়াই করার মতো টাকা যেন আমার অনেক আছে। তা ছাড়া আমি একটা মেয়ে—।'

গোপাকে থামিয়ে দিয়ে বিকাশ বলল, 'আপনার স্বামী চলে যাওয়ার পর যদি এতটা রাস্তা একা হাঁটতে পারেন, তবে শুধু মেয়ে বলে বাকিটা পারবেন না, এমন তো নয়।'

'আপনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। ওরা আমাকে উকিলের চিঠি দিয়েছে।'

এক মিনিট ভাবল বিকাশ, তারপর বলল, 'আজ আপনার সময় হবে?'

'কেন?'

'তা হলে আমার সঙ্গে ফড়েপুকুরে যেতে পারেন। আমাদের এক বন্ধু বিখ্যাত উকিল অনিল মল্লিকের জুনিয়ার। অনিলবাবুর সঙ্গেও আমার আলাপ আছে। তাঁর কাছে যাবেন।'

'কিন্তু ওদের তো শুনেছি অনেক ফি, আমি দেব কী করে?'

'তার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চিন্তাটা এখন থেকে ছাড়ুন। হ্যাঁ, এই বস্তুগুলো ছাপার হরফে পেতে গেলে কত দক্ষিণা দিতে হবে আগে বলুন তো।' সাইডব্যাগ থেকে একতাড়া ম্যানাসক্রিপ্ট বের করল বিকাশ।

সেগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে গোপা বলল, 'সে হবে খন। আগে আপনি ওপরে চলুন, আমার ছেলের সঙ্গে আলাপ করবেন।'

অনিল মল্লিক গোপার কথা মন দিয়ে শুনলেন। বিকাশ বলল, 'অনিলদা, ব্যাপারটা আপনি একটু অন্যরকম ভবে দেখুন। বেচারার স্বামী মারা যাওয়ার পর খুব অসুবিধেতে আছে।'

'অসুবিধে মানে? আমার দক্ষিণা দিতে পারবেন না, এই তো?' ছোট চোখে তাকালেন অনিল মল্লিক, 'তা হলে তো আমি কেস নিতে পারব না।'

'অনিলদা।' বিকাশ চমকে উঠল, 'ঠিক আছে, আপনার ফিস কত?'

'দ্যাখো বিকাশ, তোমাদের মতো সেন্টিমেন্টাল দেশপ্রেমীদের নিয়ে যত মুশকিল। এরকম চললে আমাকে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে হবে। শুনুন মিসেস রায়, কেস আমি নিচ্ছি, তবে একটা শর্ত থাকছে। যেদিন কোর্ট আপনার ফেবারে রায় দেবে সেদিন থেকে এক মাসের মধ্যে আপনি আমাকে হাজার টাকা দিয়ে যাবেন। এছাড়া কোর্টে যে সব খরচ হবে সেগুলো আলাদা।'

জেতার পর টাকাগুলো কোথায় পাবে মাথায় ঢুকল না গোপার। কিন্তু বিকাশ হেসে বলল, 'আপনি অদ্ভুত মানুষ।'

'ওসব ছাড়ো। আমার পাওনা আমি ছাড়ছি না। আচ্ছা, প্রেসটা যে আপনার শ্বশুর কিনেছেন তার কোনও প্রমাণ আছে? মানে কাগজপত্র?'

গোপা বলল, 'আমি ঠিক জানি না। তবে গোস্বামীবাবু বলতে পারেন। উনিই বিক্রি করেছেন।'

'তা হলে কেউ যদি মেশিন নিয়ে যেতে চায় আপনি রাজি হবেন না। মামলার শেষ না হওয়া অবধি আপনি ব্যবহার করুন।'

মিসেস বনলতা রায়ের আবেদনক্রমে মিসেস গোপা রায়ের বিরুদ্ধে কেস আদালতে উঠল। একই সঙ্গে অনিল মল্লিক পালটা কেস আনলেন এই বলে যে তাঁর মক্কেলকে অন্যায়ভাবে সম্পত্তির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। গোপা ঠিক এরকম কিছু করতে মন থেকে সায় পাচ্ছিল না। রায়বাড়ির সম্পত্তির ওপর তার কোনও লোভ নেই। কিন্তু অনিল মল্লিক বললেন, 'বেশ তো, যদি ওটা আপনার

হাতে আসে তা হলে কোনও মিশন-টিশনে দান করে দেবেন। আপনাকেই ভোগ করতে হবে এরকম মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি।'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাটছে দিনগুলো। অনেকদিন পরে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হলেন শিবনাথবাবু। এসে কোনওরকম ভণিতা না করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এখানে আঙুর এসেছে?'

গোপা অবাক হল, 'আঙুর? আমার কাছে আসতে যাবে কেন?'

শিবনাথবাবু বললেন, 'আমি জানি আসবে না, তবু তোমার শাশুড়ির হুকুমে খোঁজ নিয়ে আসতে হল। হা হা—এই তো মজা।'

গোপা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, সে কি বাড়িতে নেই?'

একটা হাত মাথার ওপরে ঘুরিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করলেন শিবনাথ, 'পাখি উড়ে গেছে। তোমার শাশুড়ি এখন ফিরে আয় বলে চেঁচাচ্ছেন। যাওয়ার সময় কী করেছে সে জানো? তোমার শাশুড়ির গয়নাগুলোর সঙ্গে তার বাবার লুকোনো সিন্দুকের টাকা সাফ করে নিয়ে গেছে। হে হে, ও বাড়িতে এখন কানাকড়িও নেই।' কথাটা শেষ করেই মুখে ঢাকের বোল তুললেন শিবনাথ, 'ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ, ঠাকুর যাবি বিসর্জন।'

গোপা হাঁ করে শুনছিল এই বৃদ্ধের মুখে কী অপার্থিব আনন্দ। সে অন্যমনস্ক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সিন্দুকের চাবি পেল কী করে?'

'বাপ মরার আগেই হাতিয়ে রেখেছিল। এদিকে তোমার শাশুড়ি সে চাবির খোঁজে দিশেহারা, আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এমনকী কত কিছুর লোভ দেখান। আহা ঘরে যে কালসাপ বসে আছে বাইরের লৌহবাসর তাকে কতটা আটকাবে।'

'কোথায় গেছে সে?'

'কোথায় আবার? সেই ফিল্ম কোম্পানির নাগরের সঙ্গে তিনি উধাও। তুমি তো আমার কথা শুনলে না এখন নেপোয় মারল দই। মেয়েছেলেটা এখন ছটফট করছে, এখন ওই বাড়ি আর এই— তুমি তো আবার পালটা মামলা করেছ? কে যুক্তি দিচ্ছে?'

'সে খোঁজে আপনার দরকার কী?' গোপা শক্ত হল।

শুনলাম অনিল মল্লিক কেস লড়ছে। তার তো শুনেছি অনেক খাঁই। টাকা পয়সা পাচ্ছ কোত্থেকে? অবশ্য তুমি না বললেও আমি সব খবর পাব।'

'এবার আপনি যান।'

'যাবই তো যাবই তো। তুমি তো কখনও আমাকে আসতে বলোনি। তা এবার সে মাগির কানে প্রেসের মেশিনের কথা বলি। হাত খালি হয়ে বসে আছে, শুনলে লাফিয়ে উঠবে হাতাতে।' শিবনাথবাবু যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

'আপনি ভেবেছেন কেউ এলেই আমি প্রেস দিয়ে দেব। এটা যে পতিতপাবন রায় কিনেছিলেন তার কোনও প্রমাণ আছে?'

'অ্যাঁ। তুমি হিন্দু ঘরের বউ হয়ে শ্বশুরের নাম উচ্চারণ করলে? তা তো হবেই—হুম। ঠিক আছে, আমি চলি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল গোপা। আঙুর ওর মায়ের ওপর টেক্কা দেবে কল্পনা করতে পারেনি কখনও। পাপের ধন বোধহয় এভাবেই নরকে যায়। ও ভাবতে পারছিল না বনলতা এখন কী করবেন। গা ভর্তি গয়না না থাকলে যে মানুষের ঘুম আসে না, আজ সব খোয়া যাওয়ার পর তার কী অবস্থা হতে পারে? সিন্দুকের লক্ষ টাকার বান্ডিলগুলোর কথা মনে পড়ল। না, হতে পারে না, আঙুর কিছুতেই সুখী হতে পারে না।

আদালতে যখন উভয়পক্ষের সওয়াল জবাব চলছে তখনই ঘটল ব্যাপারটা। কেসের দিন পড়লেই গোপাকে আদালতে যেতে হত। এমন নয় অনিল মল্লিক ওকে প্রতিদিনই প্রয়োজন মনে করতেন, কিন্তু না গেলে সে নিজে স্বস্তি পেত না। চোখের আড়ালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বিকাশ মাঝে মধ্যে আসে, কয়েকদিন গোপার সঙ্গে হাজিরাও দিয়েছে কিন্তু ইদানীং সে কংগ্রেসের

কাজে ভীষণ ব্যস্ত। মানুষ অদ্ভুত, নিজে বিয়ে থা করল না, গাঁয়ের মানুষগুলোকে শিক্ষিত করতে জীবনটা কাটাল। অনেকদিন ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছে গোপা এই নিয়ে শেষতক একদিন গোপাকে বলেই বসল সে, 'ঠিক আছে, অত যখন বলছেন তা হলে একটা পাত্রী খুঁজুন।' উৎসাহিত হল গোপা 'সত্যি বিয়ে করবেন বলুন? তা হলে বাংলাদেশের সেরা মেয়েকে—।'

বিকাশ ওকে থামাল, 'কিন্তু আমার যে একটু দাবিদাওয়া আছে।'

গোপা অবাক বল, 'সেকী! আপনিও! এটা আশা করিনি।'

'কী করি বলুন। এগুলো না হলে যে চলে না।' বিকাশ কপট ভঙ্গি করল।

'বেশ, বলুন, আপনার দাবিগুলো শুনি।'

'মেয়েটিকে কালা, বোবা এবং অন্ধ হতে হবে।' বিকাশ গম্ভীর হল।

'ধ্যেৎ, আপনার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি।' গোপা হাল ছেড়ে দিল।

বিকাশ হাসল, 'আমার যে অবস্থা তাতে কোনও মেয়ে চোখ মেলে তা সহ্য করবে না, কান পেতে শুনলে পাগল হবে আর বোবা না হলে আমার শ্রাদ্ধ করবে। মানুষের মন বড় বিচিত্র জিনিস। এই ধরুন, আমি আপনার কাছে আসছি তাই নিয়ে আপনার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কত জল্পনা শুরু হয়ে গেছে।' বিকাশ হাসল।

'তার মানে? কোত্থেকে শুনলেন একথা?' গোপা চমকে উঠল।

'জিজ্ঞাসা করবেন না। এসবে আমার কিছু এসে যায় না, আপনার না গেলেই হল।'

গোপা ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভেবেছে। কে কী বলছে সত্যি তা ভাববার মতো মানসিক অবস্থা এখন নেই। যাকে প্রতি নিয়ত লড়তে হচ্ছে তাকে চক্ষুলজ্জা ছাড়তেই হবে। আর এ লজ্জার কী দাম আছে। যদি তা কাজে না আসে? গঙ্গা জলের মতো। হিন্দু সংসারে শুধু শুদ্ধিকরণের জন্য যার প্রয়োজন কিন্তু বুক ভরা তৃষ্ণায় যে জল খেতে ঘেন্না হয়। এসব সংস্কারের মাথায় পা-চাপা দিতে আজ কোনও দ্বিধা নেই গোপার।

এরকম সময় একদিন ব্যাঙ্কের চিঠিটা পেল গোপা। ম্যানেজার তাকে দেখা করতে বলেছেন। প্রেসের প্রয়োজনে ওদের একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। পতিতপাবন কেনার পর সেটা সমীরকান্তি আর গোপার নামে জয়েন্ট এ্যাকাউন্ট আছে। অনেক পার্টি চেক দিতে চায় তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু এই চিঠি সেই ব্যাঙ্ক থেকে আসেনি। কী করবে বুঝতে না বুঝতে দিন দুয়েক চলে গেল। যে ঠিকানা চিঠিতে আছে সেটা হাজরা রোডে। কোনওদিন ওদিকটায় যায়নি সে। এই সময় বিকাশ এসে পড়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল গোপা। চিঠিটা দেখে বিকাশ বলল, 'এতে এত নার্ভাস হওয়ার কী আছে। আজই চলুন, দেখে আসি কী ব্যাপার।'

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অবাঙালি, ওদের খাতির করে বসালেন। তারপর ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'মি. রায়, আপনার অ্যাকাউন্টটার বিষয়ে কিছু চিন্তা করেছেন?'

বিকাশ হেসে ফেলল। আড়চোখে একবার গোপাকে দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি ভুল করছেন। আমি ওঁর বন্ধু, উনি উইডো।' গোপার ঠোঁটে সামান্য কম্পন।

ভদ্রলোক দুঃখিত দুঃখিত বলে যেন শোধরাবার চেষ্টা করলেন, 'ব্যাপারটা হল মিসেস রায়, যার সঙ্গে আপনার জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল তিনি মারা গেছেন বলে আমরা খবর পেয়েছি। এখন এই টাকাটা আপনি তুলে নিতে পারেন অথবা অ্যাকাউন্টটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন। যা ইচ্ছা আপনার।'

হকচকিয়ে গেল গোপা। সে বিব্রত হয়ে বিকাশের দিকে তাকাল। একটু আগে বিকাশ কী স্পষ্ট উচ্চারণ করল, আমি ওঁর বন্ধু। কথাটা শোনা অবধি সেটা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আবার একী শুনছে সে। কীসের টাকার কথা উনি বলছেন? এই ব্যাঙ্কে কোনও অ্যাকাউন্ট সে কোনওদিন খোলেনি। সমীরকান্তি মারা গেছে অনেকগুলো বছর হল, আজ এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে? ওর মনে হল ভদ্রলোক কোথাও ভুল করছেন। সে একটু চিন্তা করে বলল, 'মারা যাওয়ার খবরটা আপনারা কবে পেয়েছেন?' ম্যানেজার শরীরটা পেছনের চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'সেটা একটু অদ্ভুত ব্যাপার। ওঁর মেয়ে এসেছিলেন আমার কাছে। উনি বাড়িতে কী কাগজ পেয়ে জানতে পেরেছেন এই ব্যাঙ্কে ওঁর অ্যাকাউন্ট ছিল। মি. রায় যে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে গেছেন তা উনি জানতেন না। শি চ্যালেঞ্জড মি। আমি তাকে

কাগজপত্র দেখালাম। মি. রায় ও আপনার সই আছে তাতে। আই ডোন্ট নো কিন্তু মনে হল উনি খুব হতাশ হলেন।'

বিকাশ যেন বিস্ময় কাটিয়ে উঠেছে, সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি পতিতপাবন রায়ের কথা বলছেন?'

'ইয়েস।' ভদ্রলোক এবার অবাক হলেন, 'আপনারা জানেন না?'

'একজ্যাক্টলি। মি. রায় ব্যাপারটা বোধহয় গোপন রাখতে চেয়েছিলেন।' বিকাশ বলল।

'কিন্তু মিসেস রায় তো ফর্মে সই করেছেন। তাঁর দু-তিনটে স্পেসিমেন সই আছে।' তারপর কী ভেবে একটা সাদা কাগজ সামনে এগিয়ে উনি গোপাকে বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন তা হলে এখানে একটা সই করবেন? পুরো সই।'

গোপা ইতস্তত করে নিজের নাম সই করলেন। ভদ্রলোক কাগজটা নিয়ে পাশে রাখা ফাইল থেকে একটা ফর্ম বের করে সইটা মিলিয়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এ দুটো আপনারই সই। কিন্তু আপনি জানেন না কী রকম?'

এবার গোপার মনে পড়ল। সেই বিকেলে পতিতপাবন রায় ওদের প্রেসে বসে কতগুলো কাগজে ওকে সই করতে বলেছিলেন। চোখ বুঁজে সই করে দিয়েছিল গোপা। এই নিয়ে তিরস্কারও করেছিলেন পতিতপাবন। কিন্তু সেই ফর্মটা যে এই জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের জন্য তা জানা ছিল না গোপার। ও বলল, 'এখন মনে পড়ছে, উনি সই করিয়ে নিয়ে আমাকে কিছু বলেননি। উনি আমার শ্বশুরমশাই হতেন তো—।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'ও তাই বলুন। এরকম কেস আমি আরও কয়েকটা পেয়েছি।' বিকাশ দেখল সন্দেহের যে মেঘটা ভদ্রলোকের মুখে দানা বাঁধছিল সেটা কেটে যাচ্ছে। সে আর একটু যোগ করল, 'আমাদের হিন্দু সমাজে এককালে শ্বশুর ভাশুরের সঙ্গে বাড়ির বউরা কথাই বলত না।'

'জানি জানি।' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'মিসেস রায়, আপনি বোধহয় জানেন না যে ঠিক কত টাকা আপনাদের অ্যাকাউন্টে আছে? তাই না?' গোপা ঘাড় নাড়ল।

'ঠিক তিরিশ মাস ধরে নিয়মিত মাসে চারশো টাকা জমা পড়েছে এই অ্যাকাউন্টে। দ্যাট মিনস্ টুলেভ থাউসেন্ড প্লাস ইন্টারেস্ট। লাস্ট ডিপোজিট এবং মারা যাওয়ার মধ্যে অবশ্য অনেকটা গ্যাপ, আই ডোন্ট নো হোয়াই। নেট রেজাল্ট হল তেরো হাজার নশো আশি টাকা। বলুন এবার কী করবেন?' উৎসুক হয়ে তাকালেন তিনি গোপার মুখের দিকে। হতভম্ব হয়ে গোপা বিকাশের দিকে তাকালেন। এত টাকা যে এখানে তার জন্যে জমা রয়েছে একথা সে ঘুণাক্ষরে জানত না। বিকাশ বলল, 'টাকাটা এই মুহূর্তে তোলার দরকার নেই, আপনি বরং ওঁর নিজের নামে অ্যাকাউন্টটা ট্র্যান্সফারের ব্যবস্থা করুন।'

কাগজপত্র সই হয়ে গেলে ওরা বেরিয়ে এল। বাইরে এসেই গোপা বলল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।'

বিকাশ বলল, 'মানুষের চরিত্র বোঝা অসম্ভব, এটা আবার প্রমাণ হল। কিন্তু আপনি তো সই করেছেন ফর্মে, কিছু জানতেন না?'

ঘাড় নাড়ল গোপা, 'সেদিন অন্ধের মতো সই করেছিলাম। এখন লজ্জা লাগছে এই ভেবে যে সেদিন মনে হয়েছিল আমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উনি সই করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে আজ।'

বিকাশ বলল, 'কিন্তু তিরিশ মাস নিয়মিত টাকা জমিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন কেন?'

গোপা বলল, 'এর একটা কারণ এখন মাথায় আসছে। প্রতি মাসে শ্বশুরমশাই প্রেসের অংশীদার হিসেবে ওঁর শেয়ার চারশো টাকা লোক পাঠিয়ে নিয়ে যেতেন। আমি হিসেব রাখতাম তাই জানি। কিন্তু সে টাকা যে আমার জন্যে জমা হচ্ছে সে কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।' ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল গোপা।

বিকাশ দেখল ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়ানো কিছু মানুষ বেশ কৌতূহলী হয়ে গোপাকে দেখছে। সে চাপা গলায় বলল, 'চলুন যাওয়া যাক।'

হাঁটিতে হাঁটিতে গোপা বলল, 'টাকাটা নিয়ে আমি কী করব?'

বিকাশ বলল, 'কী আশ্চর্য। এখন আপনার টাকার কত প্রয়োজন। মামলা চলছে তার ওপর সায়কের পড়াশুনা আছে—'

গোপা বলল, 'কিন্তু ওটা তো আমার টাকা নয়। কেউ দান করলে আমায় নিতে হবে?'

'এখন আইন বলছে আপনারা টাকা। আপনি ভীষণ সেন্টিমেন্টাল তো। এদিকে টাকার জন্য আপনার ননদ ব্যাঙ্কে হম্বিতম্বি করে বেড়াচ্ছেন, শুনলেন তো। তা তিনি তো শুনেছি বাবার যাবতীয় ক্যাশ মায়ের গহনা হাতিয়েছেন। তবু তার তৃষ্ণা মেটেনি।' বিকাশ বোঝাতে চাইল, 'এটা দান বলছেন কেন, একটা মানুষের ভালবাসা হিসেবে নিন না।'

'ভালবাসা? মানুষটা বেঁচে থাকতে একদিন ভাল কথা বলেনি আর—।' কথাটা বলতে গিয়ে সে থেমে গেল।

বিকাশ বলল, 'কী হল?'

'আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি একটা কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম, কী আশ্চর্য ব্যাপার। আমার মাথাটা একদম গেছে।' গোপা বলল।

'কথাটা শোনা যাক। আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আমি একটু শিয়ালদা যাব।'

বিকাশের কথাটা ঠিক শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না, গোপা অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিকাশ তাড়া দিল, 'কী হল?'

গোপা তাকাল, 'জানেন, সেদিন উনি একটা কাগজে সই করিয়ে আমায় বলে গিয়েছিলেন যে সায়কের নামি কুড়ি হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিচ্ছেন। দশ বছরের আগে সেটা তুলতে পারব না এবং টাকাটা ওর পড়াশুনার জন্য খরচ করতে হবে। কথাটার কোন গুরুত্ব দিইনি সেদিন। ভেবেছিলাম রায়বাড়ির জলস্রোতের মতো মিথ্যে কথার মধ্যে এটিও একটি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—।'

'গুরুত্ব দেননি কেন?'

'দিইনি কারণ মানুষটাকে আমরা অর্থপিশাচ বলে ভাবতাম। টাকার কাছে স্নেহ প্রেম যেন হার মেনে যেত, এমনকী ব্যবহারে সেটা বড় উগ্র হয়ে প্রকাশ পেত। কিন্তু তিনি যে এরকম একটা কাণ্ড করে যাবেন—।' নিশ্বাস গাঢ় হল গোপার।

'সায়কের নামে টাকাটা কোথায় জমা-আছে?' বিকাশ মনে করিয়ে দিতে চাইল।

গোপা এক মুহূর্ত চিন্তা করল, 'আমার কাছে কোনও কাগজপত্র দিয়ে যাননি উনি। আমি কিছুই জানি না। ব্যাঙ্কে রেখেছেন হয়তো।'

বিকাশ চিন্তিত গলায় বলল, 'কলকাতা শহরে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কম নয়। তা ছাড়া দীর্ঘকাল টাকা জমানোর ব্যাপারে পোস্ট অফিস বেশি লাভজনক। সেখানেও উনি রাখতে পারেন। আসলে কাগজপত্র না থাকলে কিছুই করা সম্ভব নয়। মনে হয় সেগুলো এখন আপনার ননদের হাতে চলে গেছে, সহজে পাবেন বলে বিশ্বাস করি না।'

গোপা মাথা নাড়ল, 'যাক, ওনিয়ে চিন্তা করি না। বিকাশবাবু আমার পাওয়ার ভাগ্যটায় এত বড় ফাটল আছে যে পেয়েছি জানার আগেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। নইলে আপনার বন্ধু এভাবে চলে যাবে কেন?'

বিকাশ কথা ঘোরাতে চাইল, 'অনেকদিন আপনার উকিলের কাছে যাইনি, কেসের অবস্থা কী? আপনাকে কবে জেরা করা হবে?'

'সামনের মাসের সাত তারিখে। ব্যাপারটা এখন কীরকম অস্বস্তিকর হয়ে। দাঁড়িয়েছে।' গোপার মুখের দিকে তাকিয়ে বিকাশ বলল, 'আমি যে আমি সেটা আপনি পছন্দ করেন?'

গোপা চমকে তাকাল, 'মানে?'

বিকাশ হাসল, 'আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারি না। আমি ডুবুরি নই।'

গোপা বলল, 'আমি যদি নিজেকে বুঝতে পারতাম।'

আদালতে সেদিন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল গোপার। অনিল মল্লিক বলেছিলেন, 'যখনই আপনার

হাজিরা থাকবে তখনই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এতে জজের মন নরম হবে।' সেই মতো যাচ্ছিল গোপা। কিন্তু তাতে বেচারা ছেলেটার কষ্ট খুব কম হয় না। সারাটা দিন ওইরকম নীরস জায়গায় ওকে বন্দি করে রাখা, শেষের দিকে ঘ্যানঘ্যান শুরু করে দেয়। সাত তারিখে সে ইচ্ছে করে সায়ককে নিয়ে এল না। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে এই নোংরামোর খেলায় পরিস্থিতি ওকে বাধ্য করেছে জড়াতে কিন্তু ওইটুকুনি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসায় নিজেকে আরও ছোট করে দেয়।

অনিল মল্লিকের জুনিয়র বললেন, 'কী ব্যাপার, আজ একা কেন?'

গোপা সত্যি কথা বলল, 'ওকে ইচ্ছে করেই আনলাম না।'

জুনিয়র বললেন, 'ভালই করেছেন, শুনছি আজ কেস উঠবে না। ওদিকের খবর শুনেছেন? মিসেস বনলতা রায়ের হয়ে কেস তদারক করছেন ওঁর মেয়ে আঙুর গুহ। আজ কোর্টে উনি এসেছেনও।'

গোপা হকচকিয়ে গেল। এটা কী করে সম্ভব? এই সেদিন যে-মেয়ে সর্বস্ব চুরি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে-মেয়েকে শাশুড়ি তাঁর হয়ে কেস দেখাশুনার ভার দিলেন কী করে? রায়বাড়ির ব্যাপারগুলো এত গোলমেলে গোপার মনে হল সে কোনওদিন তাল রাখতে পারেনি। আজও পারল না। খানিক বাদেই আঙুরকে দেখতে পেল সে। ইদানীং মোটা হয়েছিল এখন সেই মেদে জেল্লা এসেছে। খুব দামি বেনারসি পরনে, এই পোশাকে কেউ আদালতে আসে না, রুচি বোঝা যায় এটুকুতেই। দু হাত কান গলায় সোনা লেপন করেছে, কপালে রুপোর টাকার মতো সিঁদুরের টিপ। চোখাচোখি হয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওর সঙ্গে যে সিড়িঙ্গে চেহারার বয়স্ক মানুষটি তিনি ওর স্বামী? গোপার একবার ইচ্ছে হল এগিয়ে গিয়ে আঙুরের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু তার আগেই ও দেখল সেই লোকটা এদিকে আসছে। কিছু ভাবার আগেই লোকটা বলল, 'নমস্কার। আপনি তো গোপা বউদি? আমি আঙুরের বর। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

গোপা গম্ভীর গলায় বলল, 'বলুন।'

শব্দ করে হাসল লোকটা, 'মামলার ব্যাপারে কিছু বলব না। তাতে আপনাকে হারাবার ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে গেছে। কোর্টকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে আপনি অসৎ চরিত্রের মেয়েমানুষ তাই আপনার কাছে রায়বাড়ির একমাত্র বংশধরকে রাখা নিরাপদ নয়।' হাসিটাকে টেনে নিয়ে বাঁকা কথাগুলো জুড়ল লোকটা, 'এসব কথা বলতে আমি আসিনি, বলে ফেললাম।আমি অন্য কথা বলছি মানে আঙুর বলাচ্ছে তাতে আপনাদের উভয়ের লাভ।'

গোপা হতভম্বের মতো লোকটার দিকে তাকাল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না এখন, যেন সমস্ত শরীরে জ্বলন্ত সিসা ঢেলে দিয়েছে লোকটা, ও চোখ কুঁচকে তাকাল।

'আপনার শ্বশুরমশাই একটা কীর্তি করে গেছেন। পুরনো কাগজ ঘেঁটে আঙুর একটা অ্যাকাউন্ট পেয়েছে যাতে আপনার ছেলের নামে বিশ হাজার টাকা জমা আছে। আপনি জানেন?'

ঘাড় নাড়ল গোপা, 'হ্যাঁ।'

'কোন পোস্ট অফিসে তা জানেন?'

নিঃশব্দে না বলল গোপা।

'এই হল মজা। ওসব পেপার না জমা দিলে পোস্ট অফিস কখনও আপনাকে টাকা তুলতে দেবে না। আর কাগজপত্র আপনি পাচ্ছেন না, যদি আপনি এই একটি ব্যাপারে আঙুরের সঙ্গে হাত না মেলান। বিশেষ কিছু না, আধাআধি পেলেই আমরা ছেড়ে দেব কাগজপত্র। নাই মামার চেয়ে কানা মামা পাওয়া আপনার পক্ষে উচিত কাজ হবে।' লোকটা দাঁত বের করল।

অনেক কষ্টে ওকে চড় মারবার স্পৃহা দমন করল গোপা। তারপর অত্যন্ত ঘেন্না মাখানো গলায় প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করল, 'আপনার স্ত্রীকে বলে দেবেন কানা খোঁড়া সিড়িঙ্গে মানুষের ওপর আমার করুণা আছে, কিন্তু গ্রহণ করতে রাজি নই। এসব প্রস্তাব ভবিষ্যতে দেওয়ার আগে চিন্তা করবেন।'

হনহন করে আদালতের চত্বরটা পেরিয়ে এল গোপা। আসবার সময় উত্তেজনায় অনিল মল্লিকের সঙ্গে দেখাও করে এল না। কোথাও গিয়ে চুপচাপ কাঁদতে পারলে ভাল লাগত, সহ্যের শেষ সীমাটা বড় কাছে এগিয়ে এসেছে, গোপার মনে হল সে আর পারবে না।

সায়ককে কি এভাবে কেড়ে নেওয়া যায়? মায়ের নামে মিথ্যে গল্প বানিয়ে তার ছেলেকে বংশের

মুখ রক্ষা করার অজুহাতে সরিয়ে নেওয়া যায়? ব্যাপারটা অনিল মল্লিককে জানিয়ে আসা হল না। মিথ্যে গল্প—অপবাদ, কী দিতে পারে ওরা? যাদের সর্বাঙ্গে নোংরা জল থিকথিক করছে তারা অবশ্য নির্দ্বিধায় কাদা ছুঁড়তে পারে, কিন্তু একটা প্রমাণ নেই তার সমীরকান্তি চলে যাওয়ার পর এতগুলো বছর একা একা দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সে লড়াই করে যাচ্ছে। একমাত্র বিকাশ ছাড়া কেউ তার পাশে কখনও এসে দাঁড়ায়নি। যদি নোংরামি করার ইচ্ছে থাকত তা হলে এই শহর স্বচ্ছন্দে হাত বাড়িয়ে দিত শিবনাথবাবুরা তো আছেনই। হঠাৎ ওর খেয়াল হল ওদের লক্ষ এবার বিকাশ নয় তো। বিকাশের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে কোনও গল্প চালু হচ্ছে না তো! ও ভাবতে পারছিল না কথাটা শুনে বিকাশের কী প্রতিক্রিয়া হয়। ওরকম সহজ মানুষটা—ও ঠিক করল বিকাশকে সতর্ক করে দেবে।

প্রেসটা এখনও চলছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির উনুনে যেমন মাসের শেষেও আগুন জ্বলে তেমনি চলার জন্য চলছে। কর্মচারী বলতে মেশিনম্যান-কাম-ম্যানেজার সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, দুজন কম্পোজিটার ব্যাস। গোপার কাছে একটা ব্যাপার বেশ রহস্যময় মনে হয়। শিবনাথবাবুর জানা সত্ত্বেও ও বাড়ি থেকে কেউ প্রেসের মেশিন দখল করতে আসেনি। হয়তো শিবনাথবাবুই তাদের খবর দেননি কিংবা এ সংক্রান্ত কাগজপত্র খুঁজে পায়নি। এই সময় শিবনাথ নিজেই এলেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে খুব গম্ভীর গলায় বললেন, 'অত্যন্ত জরুরি আলোচনা আছে।' গোপা প্রুফ দেখছিল মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার সঙ্গে?' আজকাল সে শিবনাথের সামনে মাথার ঘোমটা টানে না। ইচ্ছে করে লোকটাকে হেয় করতে চায়। খেঁকিয়ে উঠলেন শিবনাথ, 'তোমার সঙ্গে নাকি ওই মেশিনটার সঙ্গে? তোমার এই নির্বুদ্ধিতার জন্যই তুমি মরবে। ব্যাপারটা জরুরি, ওদের ওপাশে যেতে বলো।' চোখ দিয়ে সামনে দাঁড়ানো কম্পোজিটারদের দেখালেন শিবনাথ।

গোপা দেখল বৃদ্ধ উত্তেজনায় কাঁপছেন। ব্যাপারটা যে জরুরি তাতে সন্দেহ নেই। সে একটু ভেবে ঠিক করল কথা বলা যাক। ঘর খালি হলে শিবনাথ এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারে বসে বললেন, 'তেলে জলে মিলে গেছে।'

'মানে?' কথা বলার ভঙ্গি দেখে গোপার বেশ মজা লাগছিল।

'মা আর মেয়ে আবার জুড়েছেন। মেয়ে স্বামী বগলে নিয়ে এখন বাপের বাড়িতে অধিষ্ঠান করছেন।' শিবনাথ মুখ বিকৃত করলেন।

'ভালই তো।'

'ভাল? জানো কী চুক্তি হয়েছে? মেয়ে মাকে বুঝিয়েছে যে যেহেতু মামলা করার মতো সামর্থ্য তার নেই সেহেতু মেয়েই মায়ের হয়ে লড়বে কিন্তু মামলা জেতার পর তাকে বাগবাজারের এই বাড়িটি দিয়ে দিতে হবে, বনলতা রাজি হয়েছেন। তার গায়ে এখন গিলটির গয়না, মেয়ে কিনে দিয়েছেন বউবাজার থেকে।' কথাটা বলে দ্রুত কয়েকবার ঘাড় নাড়লেন শিবনাথ, 'এ আমি সহ্য করতে পারছি না। বনলতার মতো লোভী স্বার্থপর মেয়েছেলে ইস্। ওই মেয়ে তোর সর্বস্ব নিল আর মামলার লোভে তুই আবার তাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দুধকলা খাওয়াচ্ছিস।'

গোপা বলল, 'এই আপনার জরুরি কথা। আর ওদের মিল হয়েছে বলে আপনার জ্বলবার কোনও কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। ওরা তো কিছু বলেনি আপনাকে।'

'বলেছে।' মাথা নাড়ল শিবনাথ, 'বলেছে। আজ সকালে আঙুর আমাকে ডেকে বলল, বাবা কি আপনার কাছে কোনও টাকা পয়সা পেতেন? একটা কাগজ যেন দেখলাম। আমি বললাম, বরং উলটো। তোমার বাবার কাছেই আমার গচ্ছিত ছিল। সে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, কী জানি। তা আপনার বয়স হয়েছে, অত দূর থেকে রোজ আসার দরকার কী. লোকে কুকথা বলে। বোঝ। আদ্দিন পর এই সব শুনতে হল আমাকে। আমি যদি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিই তা হলে ওরা দাঁড়াতে পারবে মাথা উঁচু করে।' থর থর কাঁপছিলেন শিবনাথ।

'আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। আঙুর ছেলেমানুষ, শাশুড়ি তো কিছু বলেননি।' সোজা বোঝবার ভঙ্গিতে বললাম।

'সে হারামজাদির কিছু বলার ক্ষমতা আছে। সে জানে আমার হাতে এমন তান্ত্রিক আছে যে সব

ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। সে ভয় পায় আমাকে। কিন্তু আমি কী শুনলাম জানো, আঙুর তোমার নামে কুৎসা রটিয়ে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এবার আমি ছাড়ব না। আমার হাতে তুরুপের তাস আছে।'

সোজা হয়ে বসলেন শিবনাথ। তারপর গলা পালটে বললেন, 'তুমি রাজি হয়ে যাও। আমার একটা চাপে বনলতা হাওয়ায় উড়ে যাবে, মাথা উঁচু করার শক্তি থাকবে না। শুধু তুমি যদি হ্যাঁ বলো তা হলে—' পকেট থেকে একটা খাম বের করে সামনে ধরলেন শিবনাথ, 'এর মধ্যে দশটা চিঠি আছে। যৌবনে বনলতা আমাকে লিখেছিল। রগরগে সব চিঠি, সব খোলাখুলি হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি এখনও এগুলো পড়লে যুবক হয়ে যাই। এই চিঠিগুলো যদি তুমি কোর্টে দাখিল করো সে উড়ে যাবে। সমস্ত রায়বাড়ি তোমার হয়ে যাবে। তুমি রাজি হয়ে যাও।'

বৃদ্ধের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে গোপা জিজ্ঞাসা করল, 'কী রাজি হতে হবে?'

শিবনাথ সামান্য ঝুঁকে পড়লেন সামনে, 'আমি তোমাকে রানি করে রাখব। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিন থেকে আমার মন জ্বলছে দাউ দাউ করে—আর '

গোপা চিৎকার করতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে। ময়লা প৻চা জলের নর্দমা তার চারপাশে ঘিনঘিনে ভাবটা কাটিয়ে ওঠা যায় না। তবু নির্লিপ্তের মতো সে বলল, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি কী করে?'

উৎফুল্লিত শিবনাথ স্থানকাল ভুলে গেলেন যেন, 'বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ঠকাব না।'

'কিন্তু ওই চিঠিগুলোতে কী আছে আমি জানি না।'

'তাই বলো। এগুলো তুমি পড়বে? হেঁ হেঁ এই অফিসঘরে পড়লে ঠিক জমবে না। তোমার ওপরের ঘরে গেলে কেমন হয়?' শিবনাথ প্রায় উঠে পড়েছেন।

'আমি এখানেই দেখতে চাই।' কড়া গলায় বলল গোপা।

'বেশ বেশ তাই দ্যাখো।' শিবনাথ খামটা সামনে বাড়িয়ে ধরলেন।

ছোঁয়া বাঁচিয়ে নিল গোপা। খামটা পুরনো কিন্তু ভেতরের কাগজগুলো আরও পুরনো। প্রথমটা নীল কাগজে লেখা সযত্নে চারভাঁজ করা। শিবনাথের ফ্যাসফেসে গলা শুনতে পেল গোপা, 'পর পর তারিখ মতো সাজানো আছে।'

তিন-চার লাইন পড়ামাত্র গোপার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। ও বুঝতে পারছিল চেষ্টা করেও মুখে রক্ত জমা সে থামাতে পারছে না। শিবনাথ কেন এই চিঠিগুলো নির্জনে পড়াবার সুযোগ চাইছিলেন এতক্ষণে সে টের পেল। এইরকম নির্লজ্জ কাঁচা বাংলায় কোনও মেয়েমানুষ চিঠি লিখতে পারে? সে চিঠির শেষে চোখ রাখল, তোমার প্রাণেশ্বরী বনলতা, তারপর নীচে আবার বনলতা রায়। গোটা গোটা সই।

শিবনাথ দাঁত বের করে বললেন, 'তোমার শ্বশুরমশাই, মানে বুঝলে না মানে ঠিক—।' চিৎকার করে থামিয়ে দিল গোপা, 'বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে।' মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে গেলেন শিবনাথ। আর সেই সুযোগে চিঠিগুলো ড্রয়ারে পুরে চাবি দিল গোপা।

সাপের মতো হিসহিস করে উঠলেন শিবনাথ, 'ওগুলো ফেরত দাও।'

'না!' গর্জে উঠল গোপা, 'এগুলো আর ফেরত পাবেন না।'

'কী? ফেরত দেবে না? আমি, আমি ওগুলোকে এতদিন যখের ধনের মতো বুকে করে আগলে রেখেছি আর—' কথা বন্ধ হয়ে গেল শিবনাথের।

'না পাবেন না।' গোপার কথা শেষ না হতেই শিবনাথ লাফিয়ে ওকে ধরতে চাইলেন। কিন্তু টেবিলটার দৈর্ঘ্য ডিঙোবার সাধ্য তাঁর ছিল না। আর সেই সময় গোপার গলার আর্তনাদ শুনে কর্মচারীরা ছুটে এল। প্রায় কান্না মেশানো গলায় গোপা বলল, 'ওকে বার করে দিন, জঘন্য নরক এই লোকটা।' শিবনাথের কোনও আপত্তি টিকল না। ছেলেগুলো ওকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে একটা রিকশায় চাপিয়ে দিল।

শিবনাথ এখন কথা বলতে পারছিলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে উনি দরজাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। সমস্ত শরীর যেন রক্তশূন্য, নিজের হাত নড়াবার শক্তিটুকু অবশিষ্ট নেই। রিকশাওয়ালা

কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞাসা করায় বিকৃত গলায় কোনওরকমে উচ্চারণ করলেন। 'চি-ৎ-পু-র।' চলন্ত রিকশায় বসে হঠাৎ বাঁ বুকে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করতেই তিনি ডান হাতে সে দিকটা খিমচে ধরলেন। দেহ থর থর করে কাঁপছে ঘামে শরীর ভেসে যাচ্ছে, শিবনাথ মাথা সোজা রাখতে পারলেন না।

এরকম চিঠি মানুষ কোন আনন্দে লিখতে পারে গোপার ধারণা ছিল না। কাল বিকেল থেকে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। এতদিন পরে হঠাৎ কেমন একটা অবসাদ সমস্ত শরীর মন আচ্ছন্ন করে রেখেছ—গোপা কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছিল না। এইভাবে লড়ে যাওয়া একা একা হঠাৎ কী ভীষণ ফাঁকা মনে হচ্ছে। কাল বিকেলে শিবনাথ চলে যাওয়ার পর থেকেই মনে হচ্ছে, এ চিঠিগুলোতে একটা ভয়ংকর সত্য আছে যেটা জানতে পারলে হয়তো সায়কের দিকে তাকালেও ভীষণ ফাঁকা মনে হবে। অনেকবার কৌতূহল হয়েছে কিন্তু সামলে নিয়েছে সে। একটি বিবাহিতা অশ্লীল মহিলার লালসার গল্প পড়লে তার কোনও মোক্ষলাভ হবে না। এমনিতেই গতকাল যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। এই বাড়ির দরজা থেকে একজন বৃদ্ধকে জোর করে বের করে রিকশায় তুলে দেওয়া হচ্ছে—ঘটনাটা পাড়ায় অনেকরকম মুখরোচক গল্প ছড়াচ্ছে। কম্পোজিটার দুজন যখন বলপ্রয়োগ করছিল তখন শিবনাথ নীরব ছিলেন না। ফোয়ারার মতো তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা গালাগালি পাড়ার সবাই শুনেছে। এসব ব্যাপার যে গোপাকে জড়িয়ে তাও কারও বোঝার অতীত নয়। বেশি কথা কী তার প্রেসের কর্মচারীরা যে বিস্মিত তা ওদের মুখ দেখে বোঝা যায়। ও যখন কোনওরকমে দোতলায় উঠে এসেছিল তখন সায়ক বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে শিবনাথের রিকশা করে চলে যাওয়া দেখছে। ওর পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে, মা?'

এই প্রথম নাড়া খেল গোপা। ওর মনে হল আর বেশিদিন ছেলেকে আড়ালে রাখতে পারবে না সে। ওই পাঁকের জল কখন তিরতির করে সায়কের শরীর ছোঁবে তার প্রস্তুতি নিচ্ছে। গোপা বলল, 'কিছু না।'

'লোকটা খুব বদমাশ, না মা?' সায়ক চোখ বড় করল।

ঘাড় নাড়ল গোপা প্রায় নিজের অজান্তে। তারপরই সচেতন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী করে বুঝতে পারলে?' পেছনে দাঁড়ানো সুধার দিকে তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত মাথা দোলাল, না সে কিছু বলেনি।

'খারাপ লোক না হলে তুমি কেন জোর করে তাড়িয়ে দেবে। ঠিক না?' সমর্থন চাইল সায়ক। গোপা কিছুক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'খারাপ লোক মানে কী?'

'বদমাশদের খারাপ বলে, ভাল লোকদের কেউ তাড়িয়ে দেয় না। বিকাশ জেঠুকে তুমি কোনওদিন তাড়িয়ে দেবে না, না মা?' ছেলের কথা শেষ হতে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘরে ঢুকল গোপা। ছেলেটার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল কী আকস্মিক, বিকাশকে সে কোনওদিন তাড়িয়ে দেবে না? বিকাশ তার কে? কেউ না। স্বামীর বন্ধু, কিছুদিন অনেক বিপদের সময় সাহায্যের আশ্রয় দিয়েছিল, এখনও প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়ায়। নিঃস্বার্থ শব্দটা বাস্তবে কতটা সচল তার পরীক্ষা নেওয়া হয়তো অসম্ভব কিন্তু বিকাশ অদ্ভুত নির্লিপ্তের মতো আচরণ করে গেছে। মাঝে মাঝে গোপারই মনে হত এত নির্লিপ্ততা একটা মানুষের কী করে আসতে পারে। সায়কের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে বিকাশ কি তার কাছে অপরিহার্য। গোপা হঠাৎ আবিষ্কার করল সে যেন ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

একদিকে ওই চিঠিগুলো, অন্যদিকে হঠাৎ নতুন চেহারায় বিকাশ—গোপা সারাটা রাত ছটফটিয়ে কাটাল। বিকাশ সম্পর্কে এরকম ভাবনা কখনও আসেনি তার। কিন্তু সায়কের কথাটা শোনার পর নিজেকে এত দুর্বল বলে মনে হচ্ছে কেন? তা হলে কী কোনও বাসনা গোপনে গোপনে ওর বুকের কোনায় কোনায় জমছিল? অসহায়ের মতো বসে রইল গোপা এখন কী করবে সে। তার ভেতর-বাইরে এমন করে টালমাটাল হচ্ছে কেন? পথের শেষ কোথায় জানা নেই, তবু অনেকটা পথ একা একা হেঁটে যেতে হবে সায়কের হাত ধরে, এরকমই তো ঠিক ছিল, তবে?

সকালে উঠে স্নান সেরে সায়ককে স্কুলে পাঠিয়ে সুধাকে বুঝিয়ে দিল গোপা মেশিনম্যান এলে তাঁকে কী বলতে হবে। অনেকদিন পরে একদম সাদা খোলের শাড়ি সাদা জামার সঙ্গে মিলিয়ে পরল সে। এত

সাদা যে চোখে বড় লাগে। শিয়ালদা স্টেশনটা চেনা হয়ে গেছে। ট্রেনে উঠতে একটুও অসুবিধে হল না। কিন্তু কী আশ্চর্য কেবলই মনে হচ্ছে সে একা নেই, যেন সমীরকান্তি ওর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে গোপার, ওই অত বছর আগে সেই দিনটা যেন হঠাৎ উঠে এসেছে আচমকা, সমীরকান্তি আর সে নির্বাসনে চলেছে। এমনকী সেই স্টেশনটা, ভাঙা চায়ের দোকান অথবা রিকশা—কেউ একটুও পালটায়নি। এর মধ্যে যে সময় বয়ে গেছে, এর মধ্যে যে সমীরকান্তি সব শূন্য করে চলে গিয়েছে, এর মধ্যে যে সায়ক তিলতিল করে বড় হয়েছে—এসব এই স্টেশনে পা দিয়ে একটুও বোঝা যাবে না।

প্রথমে ভেবেছিল সেই সেদিনের মতো রিকশা নিয়ে স্কুলে চলে যাবে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল একটু অন্যরকম কিছু করার, একটু আলাদা হবার। তার চেয়ে যেখানে ওরা এতদিন থেকে এসেছিল সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হল। হয়তো সেখানে কেউ নেই, বিকাশের আস্তানাটা আছে কি না তাও জানা নেই। রিকশা নিয়ে গোপা রোদ্দুর মাখা মাঠ পেরিয়ে সেই দিঘির কাছে চলে চলে। দূর থেকে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। অথচ প্রথম ওরা এসেছিল সেদিন প্রথমে মন্দিরটাকে বুঝতে পারেনি। রিকশা ছেড়ে দিয়ে গোপা দিঘির পাড়ে উঠল। কতগুলো ছাগল ওপাশে চরছে, সেই সব পাখিরা আজও ডেকে যায়। শুধু দিঘিটায় শ্যাওলা জমেছে খুব, এমনকী ঘাটটা দেখে বোঝা যায় ইদানীং কেউ সেখানে স্নান করতে নামে না। কিন্তু মাঝখানে কালো চোখের জল স্থির হয়ে আছে। দেখলেই মনে হয় ডুব দিই। ঘাড় বেঁকিয়ে মন্দিরের দিকে তাকাল সে। দরজা বন্ধ। ভৈরবী মা থাকলে এতক্ষণে চেঁচিয়ে ডাকতেন, 'এই তোরা কে রে?' মানুষটা কোথায় চলে গেলেন অমন করে! কেন?

গোপা নেমে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। একটা ছোট্ট মেয়ে গামছার্টা শাড়ির মতো জড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে বসে আছে একপাশে। গোপা দেখল বেচারার চোখে অসীম কৌতূহল। গোপা জিজ্ঞাসা করল, 'এই, এখানে পুজো হয় না?'

ঘাড় নাড়ল মেয়েটা হয়। মুখে কিছু বলল না। তা হলে হয়তো কেউ এসে দু বেলা কাজ সেরে যায়। গোপা পাশের ঘরটার দিকে তাকাল। জানলা খোলা দরজা ভেজানো বাইরে থেকে তালা দেওয়া নেই। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে কেউ থাকে না?'

আবার ঘাড় নাড়ল মেয়েটা, হ্যাঁ। এবার বিরক্ত হল গোপা, 'তুই কথা বলতে পারিস না?'

ঘাড় নাড়ল ও, না। বুকের মধ্যে ধক করে উঠল, গোপা দেখল মেয়েটা ওর দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে। সে আর দাঁড়াল না। পায়ে পায়ে দরজাটার কাছে এসে শব্দ করল। ভেতর থেকে কোনও শব্দ নেই, গোপা আলতো চাপ দিয়ে দরজা খুলল। ঘরটা তেমনি ছত্রাকার। ওপাশের তক্তাপোশে কেউ একজন আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। দেখেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। বিকাশ নয় তো! পেছনে শব্দ হতে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মেয়েটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখে চোখ পড়তেই মুখটা একপাশে কাত করে কপালে হাত দিয়ে বোঝাল জ্বর হয়েছে। বিকাশই তো? নিঃসংশয় হতে পারছিল না গোপা। ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, কে? মেয়েটি নিঃশব্দে এগিয়ে গেল মাথার কাছে, তারপর চাদরটা সরিয়ে আনল বুকের ওপর। হ্যাঁ, বিকাশ। হতভম্ব হয়ে দেখল গোপা। সমস্ত মুখ দাড়িগোঁফে ছেয়ে গেছে, চোখ বন্ধ। তার মানে অসুখটা বেশ কিছুদিন ধরে চলছে, ওর মনে পড়ল বিকাশের সঙ্গে শেষ দেখার পর অনেকটা সময় চলে গিয়েছে—এটাই খেয়ালে ছিল না।

কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, গোপা এগিয়ে গেল। মাথার পাশে সেলফের তাকটায় তিন চারটে ওষুধের শিশি, বেশির ভাগই মিকশ্চার জাতীয়। বড়িও আছে একপাতা। সেবাযত্ন কেমন হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে। সমীরকান্তি যদি এ সময় থাকত তা হলে বন্ধুকে এ অবস্থায় দেখলে তুলকালাম করত। কপালে হাত রেখে জ্বর দেখল সে। বুঝতে পারা যাচ্ছে না, শিশিগুলোর পাশে একটা থার্মোমিটার খাপের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সেটা বের করে দেখল জ্বর একশো তিনে দাঁড়িয়ে। বোধহয় শেষবার নেবার পর ঝেড়ে রাখা হয়নি। আবার তাও না হতে পারে, রোদ লেগেও তো পারা ওঠে।

মেয়েটা পাশেই দাঁড়িয়ে। গোপা ঘরটার দিকে ভাল করে তাকাল এবার। এই ঘরেই তারা অনেকগুলো মাস কাটিয়ে গেছে। এই ছোট ঘরটাকে প্রথমে দমচাপা মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু এক সময় এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোপা লক্ষ করল তাদের কোনও স্মৃতি এ ঘরে নেই। ঝেড়ে পুঁছে বিকাশ তার আগের জগতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ঘরটাকে। বিকাশের দিকে

তাকাল গোপা, না, মানুষটা মোটেই তেমন সুপুরুষ নয়। কিন্তু এমন একটা আলতো প্রসন্নতা মাখানো আছে কপালে, নাকের পাশে এমনকী যে চিবুকটা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা সেখানেও—চোখের আরাম হয়। এই সময় বিকাশ চোখ খুলল। লালচে চোখ দুটোয় সামান্য কুঞ্চন তারপর স্থির হল। হাসি মুখ করে গোপা দেখছিল। বিকাশ যেন একটুও অবাক হয়নি, নিচু গলায় বলল, 'আপনার কথা ভাবছিলাম।'

গোপা যেন হোঁচট খেল। শরীরটা কেন এমন ঝিমঝিম করছে? স্বাভাবিক হবার প্রাণপণ চেষ্টায় সে উচ্চারণ করল, 'সেকী! কেন?'

'অনেকদিন যেতে পারিনি। কেসের কী হল?'

যেন কেউ তার পায়ের তলায় মাটি এনে দিল, সামান্য থেমে গোপা বলল, 'ওতো অনন্তকাল চলবে। কিন্তু আপনি এটা বাধালেন কী করে?'

'কপালে ছিল ও কিছু নয়। হঠাৎ এত দূরে—।' বিকাশ প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না।

এই প্রশ্নটার জবাব তৈরি ছিল না, গোপা কথা এড়াতে চাইল, 'তা এসব জল দেওয়া ওষুধ খেলে শরীর সারবে? কী হয়েছে আপনার?'

'সাধারণ জ্বর কিন্তু সেটা বারো দিনেও যেতে চাইছে না। বড্ড মায়া বোধহয়।'

'বাঃ, আর আপনি এই ঘরে বসে সেটাকে তোয়াজ করছেন? ডাক্তার কী বলছে?'

'ভাল হয়ে গেলে সেরে যাবে।' বিকাশ হাসল, 'আর কোনও গোলমাল হয়নি তো।'

গোপা বুঝতে পারছিল না তার বুকের মধ্যে কেন একটা চাপা অনুভূতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। কথা সহজ হচ্ছে না কেন? অনেক কষ্টে সে বলল, 'আমার কথা আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। নিজেরটা ভাবুন।'

বিকাশ শিথিল চোখে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। গোপা বলল, 'কীরকম নোংরা হয়ে আছেন, এভাবে অসুখ সারে? দেখাশোনার জন্য একটা লোক চাই।'

চোখ দিয়ে ইশারা করল বিকাশ, 'ও আছে আমায় খুব ভালবাসে।'

'ওই পুঁচকে মেয়েকে দিয়ে কোনও কাজ হয় না।'

'একটা বড় মেয়ের খোঁজ করতে আমার সহকর্মীরা উঠে পড়ে লেগেছেন।'

গোপা খবরটা শুনল। তারপর বলল, 'ভাল। তা এতদিন যাদের জন্য করলেন তারা আসছে তো দেখতে?'

'বাঃ, আসবে না কেন? তবে সংখ্যা কমছে।'

'খাওয়া দাওয়া কী করছেন?'

'অসুখ হলে একটা সুবিধে আছে, বেশি ঝামেলা হয় না খাওয়ার। বিস্কুট মিষ্টি—এসব সায়ন্তনী এনে দেয়।'

'সায়ন্তনী সেটি আবার কে?'

'ওই তো, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে, বড় ভাল মেয়ে।'

অবাক হয়ে আবার মেয়েটিকে দেখল গোপা, গামছার আঁচল হাতে ধরে সে গোপাকেই দেখছে। হেসে বলল, 'ওর নাম রাখল কে, আপনি?'

'হ্যাঁ। বোবা বলে বাপ মা বোধহয় তাচ্ছিল্য করেই নামটাম ভাবেনি। ওর জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর । এই দেশের মাটির মতোই ওর অবস্থা, তাই সায়ন্তনী শুরু—শেষটা জানা নেই।'

'আপনি পারেন।' গোপা উঠে দাঁড়াল, 'এবার একটা রিকশা ডাকতে পাঠাই।'

'চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে নিয়ে যাব। এতদিনে যার জ্বর ছাড়ল না, এখানে তাকে ফেলে রাখা যায় না, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দিন।'

'দূর। কৃতজ্ঞতা কীসের। ওসব কথা বলবেন না। আমি তো প্রায় সেরেই উঠেছি আপনি আর ঝামেলায় জড়াবেন না।'

'ঝামেলা কেন? আপনি কি আমাকে বন্ধু মনে করেন না?'

'বন্ধু। মিসেস রায়, আমাদের এই দেশটা এখনও সুস্থ হয়নি, আমারই মতন জ্বরে ভুগছে। শুধু শুধু আপনার নামে গালগল্প বাড়বে, আপনার চারপাশে শত্রু, তারা হাতিয়ার পেয়ে যাবে।' বিকাশ আস্তে আস্তে উঠে বসল। গোপা দেখল এই কদিনে লোকটার শরীর অর্ধেক হয়ে গেছে। হঠাৎ ওর মনে হল সে হেরে যাচ্ছে। একটা অজানা জায়গা যেটা নিজের বলে মনে হচ্ছিল সেটা কেউ কেড়ে নিচ্ছে।

'আপনি দুর্নামকে ভয় করেন?' ঠাট্টার গলায় বলল সে।

'হ্যাঁ, যখন দেখি তাতে আমার কোনও লাভ নেই।'

'ও, আপনিও তা হলে লাভ লোকসান খতিয়ে পা ফেলেন।'

বিকাশ হাসল, 'আজ হঠাৎ কী হল বলুন তো? এভাবে কথা বলা আপনাকে মানায় না, সত্যি বলছি, একদম মানায় না।'

গোপা বলল, 'আমাকে কীরকম হলে মানায়?'

বিকাশ বলল, 'চারপাশে একটা কাঠিন্যের আড়াল, খুব গভীর কুয়োর মতো যার তলায় জল আছে জানা কিন্তু এমন কোনও দড়ি নেই যে বালতি ডুবিয়ে তা তুলে আনা যায়। ছেড়ে দিন এসব কথা, তেমন বুঝলে খবর পাঠাব। কেসের কী খবর বললেন না। আপনার ননদ তো নিশ্চয়ই খুব অ্যাকটিভ।'

গোপা ধীরে ধীরে নিজেকে ঠিক করল। হঠাৎ তার এমন হল কেন? ওর মনে হল সে যে এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছে বিকাশ তাকে একবারও বসতে বলেনি। একটু শক্ত গলায় সে বলল, 'আপনাকে সে সব কথা বলে লাভ কী?'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন।'

গোপা মন পালটাল, 'ওরা আমার নামে কুৎসা রটাচ্ছে যাতে আদালত আমাকে বঞ্চিত করে। কিন্তু এর মধ্যে এমন সব কাণ্ড হয়ে গেছে—।'

'কী কাণ্ড?'

'আপনি অসুস্থ, এখন সেকথা থাক।'

'মিছিমিছি আপনি আমায় চিন্তায় রেখে যাবেন।'

'আপনি আমার জন্য চিন্তা করেন?'

বিকাশ চুপ করে থাকল, শেষ পর্যন্ত গোপা সব কথা খুলে বলল। বলে ব্যাগ থেকে সেই মোটা খামটা বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো নিয়ে আপনি আমায় কী করতে বলেন?'

বিকাশ তাজ্জব হয়ে শুনছিল সব কথা। এখন বলল, 'ওগুলোতে কী আছে?'

দ্রুত মাথা নাড়ল গোপা, 'আমি পড়িনি, তিন-চার লাইনেই মনে হচ্ছিল যে বমি হয়ে যাবে। কোনও মহিলা যে এসব লিখতে পারে—।'

'আপনি পড়তে চান না?'

'না।'

'হয়তো অনেক সত্য জানতে পারতেন।'

'সে ইঙ্গিত করে গেছেন শিবনাথবাবু, তাই পড়তে চাই না।'

'বুঝতে পারছি কেন সমীরের সঙ্গে ও বাড়ির মানুষ অত খারাপ ব্যবহার করত। জন্ম থেকে বেচারা কেন ভালবাসা পায়নি ও বাড়িতে।'

'আপনি কিন্তু কল্পনা করছেন, এই চিঠিতে কী আছে আমরা কেউ জানি না, সায়কের কথা ভেবেই এই চিঠি পড়ব না, এগুলো নিয়ে কী করব?'

বিকাশ বলল, 'অনিল মল্লিকের হাতে দিলে বনলতা রায় কেস উইথড্র করে নেবেন, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'কিন্তু তার জন্য,—আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।'

'দেখুন কী করবেন সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে, এ ব্যাপারে আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। একদিকে সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা অন্যদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া—এর একটা আপনার সামনে। আপনি ঠিক করুন।'

গোপা বড় চোখে বিকাশের দিকে তাকাল, 'আমি আপনার কাছে ছুটে এলাম নিজে ভাবতে পারছি

না বলে। এ নোংরামো আমার সহ্য হচ্ছে না।'

বিকাশ অদ্ভুত গলায় বলল, 'উঁহু, এটা ঠিক কথা হল না। আপনি গঙ্গাজলের মতন, আপনাকে নোংরামি স্পর্শ করতে পারবে না। দু পারের মানুষ যত নোংরা ফেলুক, গঙ্গা জলের পবিত্রতা কী কখনও নষ্ট হয়!'

বুকের ভেতর থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল, গোপা খুব ধীরে কথা বলল, 'ঠিক আছে তাই হোক গঙ্গাজল তার পবিত্রতা নিয়ে থাকুক। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি মনে করিয়ে দিলেন কথাটা, আকণ্ঠ তৃষ্ণায় সেই গঙ্গাজল পান করতে গেলে গা ঘিনঘিন করে। আমি এরকম পবিত্রতাকে ঘেন্না করতাম। ঠিক আছে, চলি, আপনার কথা মান্য করলাম।' ঘুরে দরজার দিকে এগোল গোপা, মাথা শক্ত করে, পা টান টান।

বিকাশ বলল, 'এভাবে চলে যাবেন না!'

দরজায় দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকাল গোপা, 'কী ভাবে?'

'মিছিমিছি রাগ করছেন।'

'রাগ আমি কারও ওপর করি না। যাই।'

'যাই বলতে নেই, বলুন আসি। আর একটা অনুরোধ, নিজে থেকেই বলছি, কথা রাখবেন?'

'বলুন।' গোপা অন্যদিকে তাকাল।

'চিঠিগুলো ওর মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিন। ওরা যাই করুন দেখবেন এর চেয়ে শাস্তি আর কখনও পাবেন না।'

বিস্মিত গোপা বলল, 'তার মানে, আমাকে চিরকাল লড়াই করে যেতে হবে?'

'হুঁ।' বিকাশ মাথা নাড়ল। 'সেইটাই বিরাট জয়। নিজেদের যাচাই করে যে পাওয়া সেটার জন্য লড়াই করতে হবে, তাই না?'

গোপা আবিষ্কার করল হঠাৎ ওর বুকের সমস্ত রক্ত খুলে যাচ্ছে আর প্রবল জলস্রোত যেন দু চোখে ধেয়ে আসছে। কোনওরকমে সে উচ্চারণ করল, 'এলাম।' হন হন করে প্রখর সূর্যের তলায় হাঁটতে হাঁটতে গোপা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ভাগ্যিস তাকে এখন বিকাশ দেখতে পাচ্ছে না, এই চোখের জলে ভেসে যাওয়া মুখটা।

জ্বরো রুগির মতো বাড়ি ফিরল গোপা। মাথার ভেতরটা শূন্য, কী ভাবে যে এতটা পথ সে চলে এল নিজেরই খেয়াল নেই। বাড়ি ফিরেই যেন সব ক্লান্তি এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ তার এ কী হল, এরকম কেন হল? বিকাশ যদি শক্ত না হত, যদি ওর ডাকে সাড়া দিয়ে ফেলত তা হলে, তা হলে—। শিহরণটা পা থেকে মাথায় টোকা দিয়ে গেল। সে কি খুব অন্যায় করেছে? অথচ কোনওদিন বিকাশকে দেখে এক পলকের জন্য এ চিন্তা মাথায় আসেনি। তবু হঠাৎ যে কেন, গোপা আজ প্রথম অনুভব করল যে মানুষের মনের মধ্যে আর একটা মন আছে যেটার অস্তিত্ব সচরাচর ধরা পড়ে না। সেই মনটাই মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে ফেলে। সেটাই কি আসল মন? এর ফলে কি সে সমীরকান্তির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল না? ঠিক বুঝতে পারছিল না গোপা। আর এই না বোঝাটা যত ভারী হচ্ছিল শরীরটা তত জ্বরো তত অচল হয়ে আসছিল। আচ্ছা, বিকাশ কি বুঝতে পেরেই অমন অহংকারির মতো কথা বলল? না, কেউ কারও কাছে ধরা দেয়নি, কিন্তু বিকাশকে সে দেখিয়ে দেবে তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। বিকাশ জানে না মেয়েদের মতো ভান করতে কোনও পুরুষ পারে না। বাড়ি ঢুকতেই সায়ক ছুটে এল। 'মা তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

গোপা ঢোঁক গিলল। তারপর ছেলের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'একটু কাজ ছিল বাবা।'

'তুমি কতক্ষণ ছিলে না, আমার খুব কষ্ট হয়।' মাথা নিচু করল সায়ক।

'আর হবে না বাবা, আর আমি এতক্ষণ বাইরে থাকব না।'

আশ্বাস ছেলের মুখে হাসি আনল। সুধা পেছনে দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'তোমাকে খুঁজতে একটা লোক এসেছিল, কোথায় গিয়েছে জিজ্ঞাসা করছিল।'

'কী নাম? প্রেসের কাজে?' অন্যপ্রসঙ্গ পেয়ে যেন বাঁচল গোপা।

'না গো। বলল তোমাদের আত্মীয়।'

'আত্মীয়? কীরকম দেখতে? নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারো না?'

'না বললে কী করব। লিকলিকে রোগা, আধবুড়ো চেহারা। তুমি নেই শুনে নানারকম প্রশ্ন করছিল, কেউ আসে কি না, সন্ধেবেলায় বেড়াতে যাও কি না। লোকটা ভাল নয় বউদিমণি।' সুধা জানাল।

চট করে যে মুখটা ওর মনে এল তার তো এখানে আসার কথা নয়। আঙুরের স্বামী এখানে আসবে কেন? 'আর কিছু বলেনি?'

'ওহো হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, সেই যে বাবু এসেছিল, শিবনাথবাবু গো, তার নাকি খুব অসুখ। অঙ্গ পড়ে গেছে, নড়াচড়া করতে পারছে না, ইস্টোক না কী বলে। খবরটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল তিনি এখানে এসেছিলেন কি না গতকাল। এসেছেন শুনে আর দাঁড়াল না।'

ফিরতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, এখন বেশ রাত। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, বোধ হয় জ্বর আসবেই। নিজের মনেই হাসল গোপা, বিকাশের কাছ থেকে ওটা নিয়ে এল নাকি সে? গা গরম লাগছে, অদ্ভুত অস্বস্তি। একটু আগে সায়ক খেয়ে শুয়ে পড়েছে। আর একবার স্নান করতে পারলে হত। গোপা বারান্দায় আসতেই দেখতে পেল একটা ঢাকা রিকশা ঠুনঠুন করে ওদের দরজার সামনে থামছে। এত রাত্রে কে এল? গোপা ঝুঁকে দেখেও প্রথমে চিনতে পারেনি। লোকটার চেহারা পালটে গেছে একদম, এখন দেখলে বোধহয় বাবড়ি চুলের জন্যই চট করে মেয়েছেলে মনে হয়। সুন্দরদাকে রীতিমতো বুড়ো মনে হচ্ছে এখন। আর একজন কিন্তু রিকশা থেকে নামলেন না। গোপা শুনল সেই গলাটা, 'দরজা ঠেলে দ্যাখো তিনি বাড়ি এয়েছেন কি না!'

তারপরেই ভেতরের দরজায় শব্দ হল। সুধাকে ছেলের পাশে বসতে বলে গোপা নীচে নেমে এল। এমনকী ব্যাপার হল যে এতরাত্রে বনলতা এ বাড়িতে আসবেন? খুব নার্ভাস বোধ করছিল গোপা। দরজা খুলতে সুন্দরদা এক পলক দেখে নিয়ে দ্রুত রিকশার কাছে ফিরে গেল। গোপা শুনতে পেল, 'বাড়িতে আছে।'

'অ। তুমি রিকশায় বসো, আমি আসছি।' সুন্দরদার সাহায্যে ওকে রিকশা থেকে নামতে হল। গোপা এবার চেহারাটা দেখতে পেল। অনেকদিন বাদে শাশুড়িকে দেখছে সে। আশ্চর্য, গায়ে একটাও গয়না নেই। শুনেছিল মেয়ে নাকি কিছু নকল গয়নার ব্যবস্থা করিয়েছে—বনলতা এখন নিরাভরণা। কিন্তু কী অসম্ভব শরীর খারাপ হয়ে গেছে ওঁর। চট করে চিনতে পারত না রাস্তায় দেখলে। হাড়জিরজিরে শরীর, আচমকা কেউ যেন লালিত্য শুষে নিয়ে বার্ধক্য ছড়িয়ে দিয়েছে মুখে। দরজা খুলে দিল গোপা, 'আসুন—।' মা শব্দটা যেন হঠাৎই আটকে গেল, উচ্চারণ করতে পারল না সে।

'না।' প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে শব্দটা বললেন বনলতা, 'ভেতরে ঢোকার জন্য আসিনি।'

'তবে?'

'তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি।' গলা কাঁপছে না বনলতার।

'ভিক্ষে, আমার কাছে?'

'বাণটা তুমি তুলে নাও।'

'বাণ? আপনি কী বলছেন?'

'ঢং করো না। আমি সব জানি, কে এক ভৈরবী আছে, তাকে দিয়ে তুমি শিবনাথবাবুকে বাণ মারিয়েছ। বেচারা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার যাই বলুক আমি জানি এটা তোমার কীর্তি।' এবার আচমকা ভেঙে পড়লেন বনলতা, 'আমার সঙ্গে তোমার ব্যাপার, মিছিমিছি শিবনাথবাবুর ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছ কেন?'

পাথর হয়ে গেল গোপা। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ইনি কি চিঠিগুলোর কথা জানেন না? শিবনাথের হৃদরোগের কারণ যে ওই চিঠিগুলো হারানো—এ খবর কি ওঁর কাছে পৌঁছায়নি!

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বনলতা বোধ হয় নিশ্চিন্ত হলেন, 'লোকটা খারাপ জানি, কিন্তু সে যে আমাদের জন্য কী করেছে তা তুমি বুঝবে না। এমন ক্ষতি কেন করলে তুমি?'

'আমার স্বামীর যখন ক্ষতি হয়েছিল তখন কোথায় ছিলেন আপনি? নিজের ছেলের মৃত্যু চাওয়ার

সময় মনে ছিল না?' কঠিন হয়ে গেল—কণ্ঠস্বর।

'আমি খোকার মৃত্যু চেয়েছিলাম? ছি ছি, এ কী বলছ তুমি?'

'তা হলে তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আসেননি কেন একবারও?'

'তুমি জানো না, আমাকে তোমার শ্বশুরমশাই আসতে দেননি।'

চমকে উঠল গোপা, 'কেন?'

'সে আমি বলতে পারব না।' হু হু করে কেঁদে ফেললেন বনলতা। 'তিনি আমাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। আমার পাপের শাস্তি।'

গোপা কোনওরকমে বলল, 'আপনি যান, এখান থেকে যান।'

'যাব, কিন্তু তুমি আমাকে ভিক্ষে দাও।'

'কী বলছেন আপনি?'

'মানুষটাকে আমি ভালবাসি।' ফস করে বলে ফেললেন বনলতা, 'আজ এই বুড়ো বয়সে আমার একথা বলতে কোনও লজ্জা নেই। হয়তো আমি পাপ করেছি কিন্তু তার জন্য আমার কোনও জ্বালা নেই। বউমা, তুমি ওই লোকটাকে বাঁচিয়ে দাও।' কান্নাটা পাক খেতে লাগল গলায়।

'আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।' গোপা বলতে লাগল।

'কিন্তু সে এখান থেকে বাড়ি গিয়েই রিকশা থেকে পড়ে যায়। কী হয়েছিল তার? কেন সে এসেছিল?' ফুঁসে উঠল বনলতা।

'দাঁড়ান। আমি আসছি।' দ্রুত ওপরে উঠে এল সে। সায়ক নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কী করা যায়! ছটফট করতে লাগল গোপা। শেষ হাতিয়ার যদি তুলে দেওয়া যায় কর্ণের মতো তা হলে কীসের জোরে লড়াই করবে সে? চোখ বন্ধ করতেই বিকাশের মুখটা ভেসে এল। চিঠিগুলো ফিরিয়ে দিন, দেখবেন এর চেয়ে শান্তি আর কখনও পাবেন না। বেশ তাই হবে। আমি কথা রাখলাম। গোপা চিঠিগুলো নিয়ে অদ্ভুত অভিমানে হাঁটতে লাগল। ওর প্রত্যেকটা পদক্ষেপ যেন বিকাশের ছায়া মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাওয়ার মতো, মনটা শক্ত হয়ে গেল। মাথা নিচু করে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন বনলতা, ওপাশের রাস্তায় দাঁড়ানো রিকশায় সুন্দরদা।

গোপা বলল, 'বাণ-ফান যাঁরা মারেন আমি তাদের দলে নই এটুকু আপনি বুঝতে পারবেন না। শিবনাথবাবু কাল এই চিঠিগুলো আমাকে দেখাতে এসেছিলেন, আমি জোর করে রেখে দিয়েছিলাম।'

'চিঠি?' বনলতা অবাক হলেন, 'কীসের চিঠি?'

'চিঠিগুলোর নীচে আপনার নাম আছে, শিবনাথবাবুর বললেন, ওগুলো তাঁকে লেখা হয়েছে।' খুব কেটে কেটে কথাগুলো বলল গোপা।

মুখে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন বনলতা, 'তুমি, তুমি ওগুলো পড়েছ?'

ঘিরে ঘিরে মাথা নাড়ল গোপা, 'আমার পড়তে ঘেন্না হয়েছিল।'

'ঘেন্না? সত্যি করে বলো তুমি পড়েছ কি না?'

'আমি মিথ্যে বলি না।'

'ওগুলো সে কেন এনেছিল?'

'আপনার বিরুদ্ধে আদালতে পেশ করবার জন্য।'

একটুও অবাক হলেন না বনলতা, 'বড় হিংসুটে মানুষ, চিরকাল এক রয়ে গেল।'

'এগুলো আপনি নিয়ে যান।' আর দাঁড়াতে পারছিল না গোপা।

'আমাকে তুমি দিয়ে দিচ্ছ?' অবাক হলেন বনলতা।

'হ্যাঁ। অন্তত ওকে গিয়ে বলুন আপনি ফিরিয়ে এনেছেন। বোধ থাকলে শান্তি পাবেন।' গোপা খামটা এগিয়ে ধরল।

কাঁপা কাঁপা হাতে বনলতা চিঠিগুলো নিলেন, তারপর অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি, 'আমার কোথাও জায়গা নেই বউমা। আঙুর আমাকে জোর করে কাগজে সই করিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আমি নাকি নষ্ট বেবুশ্যে।'

'আমি কী করব বলুন?' নিরাসক্ত হতে কষ্ট হচ্ছিল গোপার।

'কিছু না, কিছু না। ওই মানুষটা পক্ষাঘাতে পড়ে আছে, বাকি দিনগুলো ওর কাছেই থাকি।' নিজের মনে কথাগুলো বিড়বিড় করলেন বনলতা। তারপর স্পষ্ট গলায় চিঠিগুলো দেখিয়ে বললেন, 'এককালে এগুলো কত আনন্দে লিখেছিলাম, লোকটা পড়ে কত সোহাগ করত, এখন এগুলোই পারার মতো সারা শরীরে ফুটে উঠেছে।'

গোপা দেখল বনলতা কেমন অসংলগ্ন কথা বলছেন। ঠিক প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে না তাঁকে। উন্মাদের হাসি তাঁর ঠোঁটে। ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, 'অ সুন্দর, সুন্দর!'

তিড়িং করে রিকশা থেকে লাফিয়ে ছুটে এল সুন্দরদা, 'কী হল?'

'বাণ ফিরিয়ে নিয়েছে গো, এই দ্যাখো, আমার হাতে দিয়ে দিয়েছে।' দু হাতে চিঠি সমেত সুন্দরদাকে জড়িয়ে ধরলেন বনলতা। 'আমাকে এবার তার কাছে নিয়ে চলো। আমি তাকে নাওয়াব, খাওয়াব, গল্প শোনাব, অ সুন্দর, আমায় নিয়ে চলো না?'

একপলক গোপাকে দেখে নিয়ে কী মমতা মাখানো গলায় সুন্দরদা বলল, 'তুমি অমন করছ কেন? কী হল তোমার?'

বনলতা বললেন, 'এ আমার পোষা কুকুর, যা বলি তাই শোনে। মানুষের মতো বেইমান নয়, না সুন্দর? বলো না?'

সুন্দরদা বলল, 'হ্যাঁ, এবার চলো, কোথায় যাবে বলছিলে?'

'তার কাছে, কোথায় যেন, চিতপুরে—হৃদয়পুরে—হি হি।'

গোপা দেখল প্রায় উন্মাদ বনলতাকে কী সোহাগে সুন্দরদা রিকশায় তুলে নিল।

রিকশাটা ঠুনঠুন করে গলি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দরজায় হেলান দিয়ে তাই দেখছিল গোপা। এখন শরীরে সেই জ্বরো ভাবটা নেই, কখন যে অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেছে শরীরটা টের পায়নি সে। বিকাশ বলেছিল দিয়ে দিতে পারলে শান্তি আসবে। একে কি শান্তি বলে? নানারকম শাসনের ফ্রেমে বাঁধানো এই মনটাকে এখন দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে ধূপ জ্বেলে যাওয়ার নাম শান্তি?

বনলতার ওই সোহাগ-আদুরে-উন্মাদ মুখটা মনে পড়ছে। একটা পক্ষাঘাত মানুষের কাছে তীর্থ করতে চলেছেন। কী আশ্চর্য, এই মুহূর্তে ওঁকে একটুও ঘেন্না করতে পারছে না সে? অর্থ-অলংকার হারানো ওই মহিলার চেয়ে নিজেকে কেন এত দরিদ্র মনে হচ্ছে?

সজোরে দরজা বন্ধ করতেই সেটা পলকেই দুদ্দাড় করে খুলে গেল। প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া এসে দরজাটাকে টালমাটাল করে দিচ্ছে। যেন ঠেলে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাওয়ার স্রোত। অনেক, অনেকদিন পরে কিংবা জীবনে এই প্রথম সেই হাওয়ায় ডুবতে ডুবতে এবং ভাসতে ভাসতে গোপা চোখ বন্ধ করল। নিজেকে যাচাই করতে করতে কারও জীবনটাই খরচ হয়ে যায় কিন্তু কারও এক পলকই যথেষ্ট, এটাই যে কেউ কেউ বুঝতে পারে না। এই হাওয়ার বিরুদ্ধে জোর করে দরজা বন্ধ করা যায়?